সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ ॥ প্রথম—চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ

প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা ৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৭২ ॥ সংখ্যা ১-৪

সূচীপত্র

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক সডাক মূল্য দশ টাকা।

পরিষদের সদস্য পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

"কৃষ্ণচরিত্রে"র ঐতিহাসিক পুনর্বিচার

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও খ্রীষ্টান পাদরীদের উগ্র ও সুতীব্র আক্রমণের প্রতিক্রিয়ার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। রামমোহন রায় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জাতীয় অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার Defence of Hindu Theism এর প্রথম ভাগে তিনি লেখেন যে, কৃষ্ণের ভক্তেরা প্রায়শঃই কৃষ্ণ ও গোপী সাজিয়া অশ্লীল ভঙ্গীসহকারে নাচগান করে ও কৃষ্ণের প্রণয় ও লাম্পট্যের অভিনয় করে। স্বামী দয়ানন্দ কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানিতে রাজী ছিলেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশে' তিনি লেখেন যে, তিনি 'হিমাদ্রি' নামক পুথির চারিখানি ছেঁড়া পাতায় পাইয়াছেন যে, বোপদেব ভাগবত রচনা করেন, আর তাঁহার ভাই জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' লেখেন'[১]। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ বা সপ্তম দশকে যাদবমন্ত্রী হেমাদ্রি বোপদেবকৃত 'মুক্তাফল' গ্রন্থের 'কৈবল্যদীপিকা' নামে টীকা লেখেন, আর বোপদেব ঐ গ্রন্থে কৃতজ্ঞচিত্তে হেমাদ্রির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 'হরিলীলা' গ্রন্থে ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণলীলা সূত্রাকারে লেখেন ও 'মুক্তাফলে' ভাগবতের ভক্তিসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি প্রকরণবদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত করেন। স্বামী দয়ানন্দ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন। মিশনারীরা কৃষ্ণকে গালি দিবার কোন সুযোগই অবহেলা করিতেন না। একজন পাদরী লেখেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা কৃষ্ণের পূজা করিবে, ততদিন তাহারা লাম্পট্যদোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ঐ কথাগুলি আবার ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ সম্বন্ধে বিবেচনার সময়ে পার্লামেন্টের রিপোর্টে প্রকাশ করা হইয়াছিল।[২]

১। সত্যার্থ-প্রকাশ (ভরদ্বাজকৃত ইংরেজী অনুবাদ, ৩য় সং) পৃঃ ৩৯০।

২। Second Report from the Select Committee of the House of Lords, ১৮৫২-৫৩, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৩২-তে আছে "Radha and Krishna are favourite deities with a great majority of the inhabitants of Bengal. The character of these objects of worship is so vile that those who describe it feel it necessary to apologize for it, by urging the plea that Krishna, being lord of the world, was not subject to those laws of morality which mortals are bound to obey. But reason and experience

এই ধরণের প্রতিকূল আলোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ভারতের জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্রষ্টিকর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী হইয়াও তাঁহাকে আদর্শ মানব ও ভারতের সংস্কৃতির ও জাতীয় অভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতেই বলিয়াছিলেন,—"অনুশীলন ধর্ম্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট"। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট অথবা বহুদারনিরতও নহেন; যে যে গ্রন্থে বা গ্রন্থাংশে ঐরূপ কথা আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত ও অপ্রামাণিক। কৃষ্ণচরিত্রের পুনর্ব্বিচার করিতে যাইয়া এই সূত্রটি মনে রাখা প্রয়োজন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "প্রচার" পত্রিকায় তিনি কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন ও কুড়ি মাস ধরিয়া কয়েকটি অধ্যায় ছাপাইবার পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে উহা বাহির করেন। কিন্তু ইহার এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে তিনি "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন*। তাহাকেই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের বীজ বা সূত্র বলা যাইতে পারে। ইহাতে তিনি এমন এক মহান্ নেতার জীবনাদর্শ উপস্থিত করেন, যিনি যুধ্যমান খণ্ডরাজ্যগুলিকে এক অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারেন। তিনি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীকরূপে কৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার মতে মহাভারত, ভাগবত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী—চারি যুগে এই চারি ধরণে কৃষ্ণের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের জাতীয় চরিত্র, সামাজিক পরিবেশ ও কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাবে কৃষ্ণের জীবনী বিভিন্ন আকারে অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, মহাভারতে ব্রজলীলার ইঙ্গিতমাত্র নাই; কিন্তু ভাগবতে উহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতিতে শুধু তাঁহার প্রণয়লীলার বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি সাঙ্খ্যযোগবর্ণিত প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু গোপীদের সহিত কৃষ্ণের লীলায় দেখিতে পান নাই। জয়দেব এই রূপক বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। যে কৃষ্ণ মহাভারতে মহাপ্রাজ্ঞ, রাজনীতিবিদ্ ও ভারতের ঐক্যসাধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাকেই জয়দেব কেবলমাত্র প্রণয়লীলায় ব্যাপৃত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতিকে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক শত বৎসরের মুসলমান শাসনের পর সংস্কৃতির এক নব অভ্যুদয়ের ধারক হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জয়দেব কেবল কৃষ্ণের দৈহিক জীবন অঙ্কন

unite in proving that his example has a frightfully contamirating power, and that natives of Bengal will never cease to be addicted to profligacy until Krishna shall cease to be the objeet of their worship, their thoughts and their affections."

৩। বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮১, পৃ: ৬০৫-৬৬১।

করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতি তাঁহার অন্তর্জীবনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন[৪]। পরবর্ত্তী কালে আর বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেব ও বিদ্যাপতির অঙ্কিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম যেরূপ উগ্র প্রক্ষিপ্তবাদী ছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে সেরূপ নহেন[৫]। তিনি প্রথম সংস্করণে বলেন যে, শিশুপাল কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ করিয়া যে কটুকাটব্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রক্ষিপ্ত ; কেন না, কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভিতর যে আদর্শ জাগিয়াছিল, তাহার সহিত উহা মেলে না[৬]। কিন্তু এখন পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যগবেষণাকেন্দ্র হইতে মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন সকল পুথিতেই ঐ শ্লোকগুলি আছে এবং উহার অকৃত্রিমতা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন[৭]। প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কংসকে কৃষ্ণের মাতুল বলিয়াও মানেন নাই[৮]। তিনি প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময় কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদিত মহাভারতের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন এবং একটি পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন যে, সংস্কৃত মহাভারতের মূলের সহিত তিনি অনুবাদ মিলাইয়া দেখেন নাই। তাহার ফলে অন্ততঃ একটি মারাত্মক ভুলের তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ; যথা—"কিয়ৎকাল অতীত হইল, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল"[৯], কিন্তু মূলে আছে যে, কংস সহদেবের অনুজাদ্বয়কে বিবাহ করেন[১০]। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তী সংস্করণে মূল দেখিয়া "দানবরাজ" বিশেষণটি বর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু "সহদেবা ও অনুজা" রহিয়াই গিয়াছে।

৪। বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৮০, পৃঃ ৬১০-১১।

কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—"যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব। এত কাল আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্ম্মোৎসব-ভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে (২।৭)"। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ভাগবতকে তিনি নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বের গ্রন্থ বলিতেছেন।

৫। প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। উহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ৪৯২+৩০ পৃষ্ঠায় দাঁড়াইয়াছিল।

৬। কৃষ্ণচরিত্র, ১ম সং, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৭। মহাভারত, পুণা সংস্করণ ২।৩৮।৪-১১, পরবর্ত্তী সমস্ত উদ্ধৃতি এই সংস্করণ হইতে।

৮। কৃষ্ণচরিত্র, ১ম সং, পৃঃ ৯১।

৯। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৩শ অধ্যায়, পৃঃ ২১১।

১০। মহাভারত, পুণা সং, ২।১৩।৩০।

তিরোধানের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ।" বঙ্কিমচন্দ্র যদি মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত তৃতীয় সংস্করণে আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটাইতেন।

যাহা হউক, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি স্বীকার করিলেন যে, রাজসূয়যজ্ঞ-সভায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনজীবনের উল্লেখ করিয়া শিশুপালের কটূক্তি প্রক্ষিপ্ত নহে। কংস যে কৃষ্ণের মাতুল এবং তাঁহার ভয়ে বসুদেব যে কৃষ্ণকে গোকুলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। কিন্তু মধ্য-ভিক্টোরিয়া যুগের নৈতিক শুচিবাই তাঁহার ও তাঁহার সমকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মন এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিনি শিশু কৃষ্ণের মাখনচুরির কথাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ইউটিলিটেরিয়ান্ মতবাদের আশ্রয় লইয়া তিনি বলিলেন যে, "ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন।" শেষোক্ত বাক্যটি ভাগবতকারের উপর আরোপ করিলেও[১১] ভাগবতে উহা নাই[১২]। তাহার পর আবার সাম্যবাদের অবতারণা করিয়া লিখিলেন,—"ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এ জন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী-মাখনের তুল্যাধিকারী।"

বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী নহেন। একটি বালক যে কালীয় নাগের মতন অতিকায় সর্পকে দমন করিয়া তাহার ফণাগ্রে নৃত্য করিতে পারে, এ কথা তিনি মানেন নাই,—উহাকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণও তিনি উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা শিল্পীদের দ্বারা পাথরে অঙ্কিত হইয়াছে। মথুরার যাদুঘরে একটি প্রস্তরখণ্ডে গো ও গোপপরিবৃত কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা অঙ্কিত আছে। উহাকে অনেকে কুষাণযুগের

১১। কৃষ্ণচরিত্র (২য় সং, সাহিত্য-পরিষৎসংস্করণ) পৃঃ ৬৯, অতঃপর কৃষ্ণচরিত্রের পত্রসংখ্যা যেখানে যেখানে উল্লিখিত হইবে, ঐ সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা বুঝিতে হইবে।

১২। ভাগবত, ১০।৯।৮।

শিল্পনিদর্শন বলিয়া মনে করেন। মাড়বারের প্রাচীন রাজধানীর মন্দিরের প্রস্তরদ্বারে মাখন চুরি, গোবর্দ্ধন-ধারণ, শকট ভঞ্জন, ধেনুকাসুর বধ ও কালীয়দমন অঙ্কিত আছে। উহাকে ভাণ্ডারকর খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। কালীয়দমনের ব্যাখ্যায় তিনি আর্য্য-অনার্য্যের সংগ্রামের কথা বলেন নাই; উহা নবীনচন্দ্রের কল্পনা। তবে গিরিযজ্ঞের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন।—"আকাশাদি জড়-পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসদের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্ম্মানুমত।" অন্যত্র, কোন ঘটনার মহাভারতে উল্লেখ না থাকিলে তিনি উহাকে পরবর্ত্তী কালের কল্পনা বা সংযোজন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন-ধারণের কথা শিশুপালের উক্তিতে আছে, যদিও তিনি উহাকে "বল্মীকমাত্র" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন[১৩]। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—"কিন্তু গোবর্দ্ধন আজিও বিদ্যমান—বল্মীক নয়, পর্ব্বত বটে।" কিন্তু মহাভারতে থাকা সত্ত্বেও তিনি উহার সত্যতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। কেন না, ঐ ঘটনা তাঁহার নিকট অতি-প্রাকৃত বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি কেবলমাত্র মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনাকেই কোন ঘটনার সত্যতার মাপকাঠি বলিয়া ধরেন নাই। তাঁহার বিচারবুদ্ধির কাছে উহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হওয়া চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিলেন, "মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই[১৪]", কিন্তু কয়েক পংক্তি পরেই তিনি বলিয়াছেন, "মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণকালে দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটা আছে।" তিনি উহার ব্যাখ্যায় লিখিলেন যে, "ঐ শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।" তিনি যদি পুণা-সংস্করণ মহাভারত দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এরূপ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না। কেন না, উহাতে ঐ শব্দটি যথার্থ পাঠ বলিয়া ধরা হয় নাই—যদিও দুইখানি প্রাচীন পুথিতে উহা পাওয়া গিয়াছে[১৫]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন ক্ষেত্রে স্যর আর. জি. ভাণ্ডারকর অপেক্ষা অধিকতর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ভাণ্ডারকর বলেন যে, মহাভারতের যে যে স্থলে গোপীদের কোনপ্রকার উল্লেখ আছে, তাহাই প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এমন কথা বলেন নাই। মহাভারতের পুণা-সংস্করণে আছে যে, সুভদ্রা যখন বিবাহের পর প্রথম স্বামিগৃহে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গোপালিকাবেশে সাজাইয়া দেওয়া

১৩। মহাভারত ২।৩৮।৯। গোবর্দ্ধন ধারণ কাহিনী হরিবংশে (২।১৮), বিষ্ণুপুরাণে ৫ ১১ ও ভাগবতে ১০।২৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪। কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ৭৬।

১৫। মহাভারত, সভাপর্ব্ব, পৃঃ ৩০৪, Du ও Cu চিহ্নিত পুথিতে ঐ পাঠ আছে।

হইয়াছিল[১৬]। গোপীদের বেশভূষা কৃষ্ণের ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই এরূপ বেশ সুভদ্রাকে পরানো হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে গোষ্ঠ-যোষিতদের উল্লেখ আছে[১৭]।

বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলার বর্ণনাত্মক শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ইহাতে "আদিরসের নামগন্ধও নাই।" তিনি শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ করিবার সময় "ররাম" এবং "রেমে" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "ক্রীড়া করিলেন"; "রতিপ্রিয়া" শব্দের মানে করিয়াছেন ক্রীড়ানুরাগিণী। কিন্তু মূলের বর্ণনায় আছে যে, স্তুতিব্যাজনিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণের গানের প্রশংসা করিবার ছলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। "কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্"। ইহাকেও তিনি আদিরসের নিদর্শন বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইউরোপীয় সমাজের দৃষ্টান্ত দিয়া যুবকযুবতীর একত্রে নৃত্যগীত করা যে নিন্দনীয় নহে, তাহা দেখাইলেন। ভাগবতের রাস-বিলাসের ১০।২৯।৪৬ শ্লোকটি তুলিয়া তিনি লিখিলেন,—"এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে না পাইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই রাধাকে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, প্রাচ্যবিদ্যার মনীষীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণিত করেন যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসরণ করিয়া রচিত। তিনি বলেন,—"প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন—কিরূপ নিপুণ গবেষক ও সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন—এই রাধাতত্ত্বের আলোচনাই তাহার চরম নিদর্শন"[১৮]। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary-র ষষ্ঠ খণ্ডে ৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বাক্‌পতি মুঞ্জের তাম্রলিপিতে আছে,—"যে রাধা-বিরহে সন্তপ্ত মুররিপুকে লক্ষ্মীর বদনরূপ ইন্দু সুখী করিতে পারে নাই, সমুদ্রের জলরাশি শীতল করিতে পারে নাই, যাহা তাঁহার নাভি-সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলও শান্ত করিতে পারে নাই, যাহা শেষ নাগের সহস্র মুখ হইতে নির্গত সুগন্ধি নিশ্বাসও ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই, তাঁহার বপু তোমাদিগকে রক্ষা

১৬। মহাভারত, ১।২১৩।১৭। পুণা-সংস্করণের আদিপর্ব্বে ৮৩০ পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে যে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে।

১৭। অশ্বঘোষ—বুদ্ধচরিত, ৪।১৬।

১৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৫।১, পৃঃ ৯।

করুক'[১৯]।" বাক্‌পতি মুঞ্জ তাঁহার ৯৮২ এবং ৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের লিপিতেও ঐ শ্লোকটি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। হালের গাথা-সপ্তশতীতে, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারে এবং বাক্‌পতির গৌড়বহ কাব্যেও যে রাধার সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। যদি বলা যায় যে, তিনি শুধু পুরাণের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলেও নিবেদন করিতে হয় যে, মৎস্যপুরাণে রাধাকে দেবী দাক্ষায়ণীর সহিত এক করিয়া বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[২০] ঐতিহাসিকেরা বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণকে পুরাণসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলেন। মৎস্যপুরাণের রাধাসম্বন্ধীয় শ্লোকটি ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে[২১] শ্রীজীব কর্ত্তৃক এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাণে কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে[২২], সুতরাং এটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন মৎস্যপুরাণ অনুসন্ধান করেন নাই, তেমনি পদ্মপুরাণেও রাধার কথা আছে কি না, তাহার খোঁজ লন নাই।

অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনায় বিশ্বাস করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র অশ্বরূপী কেশী দানবের কথা মহাভারতের শিশুপালের উক্তিতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে ও ভাগবতে পাইয়া উহাকে ঋগ্বেদের কেশীনামক দেব ধরিয়া বলিয়াছেন,—"জগদ্ব্যাপক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।[২৩] এই ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। ভাণ্ডারকর সাহেব লিখিয়াছেন যে, গীতায় কৃষ্ণের ব্রজলীলার বিষয়ে কোন কথা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এত দূর বলেন নাই—না বলিয়া ভালই করিয়াছেন, কেন না, গীতার ১৮।১ শ্লোকে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কেশিনিসূদন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং বঙ্কিমবাবু কেশিহন্তা মানে যাহাই করুন, পুরাণাদিতে লেখে যে, কেশিদানবের বধ ব্রজেই করা হইয়াছিল, অন্যত্র নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারপ্রণালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায় কৃষ্ণচরিত্রের তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে—যেখানে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাহেবদের মতন কৃষ্ণেরও কেবল একটিমাত্র পত্নী ছিল। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুরাণাদি ও মহাভারতের যে তুলনামূলক আলোচনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রুবেন সাহেব

১৯। Indian Antiquary. Vol. VI. (1876), পৃঃ ৫০। ঐ লিপি পরে Epigraphia Indica-র ২৩ খণ্ডে ১০৮ পৃষ্ঠায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

২০। মৎস্যপুরাণ, ১৩।৩৮।

২১। শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণীর টীকায় ১০।২১।১৭।

২২। P. V. Kane—History of the Dharma Sastras IV. পৃঃ ৬৯১।

২৩। কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ১১০।

কৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যা লইয়া ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রবন্ধ লেখেন[২৪]—যদিও রুবেন কৃষ্ণচরিত্র পড়িয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের প্রভায় বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণেতিহাসের তুলনামূলক বিচারপদ্ধতির পথপ্রদর্শক হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তকে কেহ মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণ যখন ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রতীক ও আদর্শ, তখন তাঁহার বিষ্ণুপুরাণকথিত ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী থাকিতেই পারে না, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করিবার জন্য ব্যগ্র। তিনি প্রথমেই নরকাসুরের কাহিনীকে অমূলক স্থির করিলেন ; কেন না, তাহা হইলে ঐ এক কথাতেই কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রীর অস্তিত্ব বিলোপ করা যাইতে পারে। নরকের কথা বলিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র কোন গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া লিখিলেন, "কথিত আছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহার রাজধানী।...নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন"।[২৫] মহাভারতে আছে যে, কৃষ্ণ নরককে বধ করিয়া ষোল হাজার স্ত্রী ও রত্নাদি লইয়াছিলেন[২৬]। হরিবংশে স্ত্রীদের সংখ্যা ১৬১০০, তাঁহারা প্রত্যেকেই একবেণীধরা ও সতীমার্গ-অনুব্রতা ছিলেন[২৭]। নীলকণ্ঠ একবেণীধরার অর্থ করিয়াছেন 'কুমারিকা'। কিন্তু হরিবংশে ঠিক পরের অধ্যায়েই আছে যে, তাহারা গন্ধর্ব ও অসুরমুখ্যদের "প্রিয়া দুহিতরস্তথা" ছিল[২৮]। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগকে দেব, দানব, ঋষি ও রাজাদের অবিবাহিতা কন্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে[২৯]। ভাগবতেও আছে যে, কৃষ্ণ নরকাসুর বধের পর তাহার গৃহে ষোল হাজার রাজন্যকন্যা দেখিতে পাইলেন ; তাহাদিগকে ভূমিপুত্র নরক আনয়ন করিয়াছিল[৩০]। এই সকল গ্রন্থে কোথাও লেখা নাই যে, তাহারা "নরকের ষোল হাজার কন্যা।" তর্ক তোলা যাইতে পারে যে, বঙ্কিম তাঁহাদিগকে নরকের পুত্রী বলিতে চাহেন নাই, কিন্তু নরকের গৃহে অবস্থিত কুমারী বলিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাও যথার্থ নহে ; কেন না, তিনি তৃতীয় খণ্ডের শেষে তাহাদিগকে নরকের মেয়ে বলিয়াছেন[৩১]। কিন্তু এ সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার করা নিরর্থক ; কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র নরকের ব্যাপারটাকে অতিপ্রাকৃত ও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া

২৪। J. R. A. S. 1941, 247ff, W. Ruben—'The Puranic Lives of Heroes.

২৫। কৃষ্ণচরিত্র, ৩।৫, পৃঃ ১২৪।

২৬। মহাভারত, ৫।১৫৫।৯।

২৭। হরিবংশ, ২।৬৩।১৩।

২৮। ঐ, ২।৬৪।২৪।

২৯। বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২৯।৯।

৩০। ভাগবত, ১০।৫৯।৩৩।

৩১। কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ১৩৮।

দিয়াছেন, এবং আরও অগ্রসর হইয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণের সময়ে নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন"। যদি তিনি 'কৃষ্ণের সময়ে' না বলিয়া 'রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে' বলিতেন, তাহা হইলে কথাটা ঠিক হইত। রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে নরকপুত্র ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা এবং তাহার অনেক আগে নরকবধ ঘটিয়াছিল[৩২]। মহাভারতে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে নরকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে[৩৩]। ষোল হাজার পত্নীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র নিজের মনের ধারণাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের আট জন প্রধানা মহিষীর সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণেতিহাসের উল্লেখ বিচার করিয়া বলিতেছেন যে, মহাভারতে (১) রুক্মিণী, (২) সত্যভামা, (৩) গান্ধারী, (৪) শৈব্যা, (৫) হৈমবতী ও (৬) জাম্ববতী, এই ছয়টি নাম দিয়া আরও অন্য পত্নী থাকার ইঙ্গিত আছে; বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে প্রথম তিনটি নাম ছাড়া (৭) কালিন্দী, (৮) মিত্রবিন্দা, (৯) সত্যা নাগ্নজিতী, (১০) রোহিণী, (১১) মাদ্রী, (১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনীর নাম আছে; উহার ৩২ অধ্যায়ে ইহার উপর শৈব্যার নাম আছে। হরিবংশের ১১৮ অধ্যায়ে উক্ত নামগুলি ছাড়া নূতন কোন নাম নাই বটে, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে (১৩) সুদত্তা, (১৪) পৌরবী, (১৫) সুভামা, (১৬) সুদেবা, (১৭) উপাসঙ্গ, (১৮) কৌশিকী, (১৯) সুতসোমা, (২০) যৌধিষ্ঠিরী এবং ওই গ্রন্থের সত্যভামা বিবাহ-প্রসঙ্গে (২১) ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনীর নাম আছে।[৩৪] এই হিসাব দিবার পর লিখিতেছেন যে, যেহেতু ১৩ হইতে ২২ সংখ্যকের নাম শুধু হরিবংশে আছে, সেই হেতু ঐ দশ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। মৌষল পর্ব্বে গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম আছে; কিন্তু ঐ পর্ব্ব প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উহাও ছাড়িয়া দিতে হইবে। জাম্ববতী ও রোহিণীকে এবং সত্যা ও সত্যভামাকে বঙ্কিমবাবু একই বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা হইলে বাকী থাকিল আট জন।

তার পর তিনি লিখিতেছেন, "ইহার মধ্যে পাঁচজন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রীসুশীলা—ইঁহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইঁহাদের কখনও কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না।" তাঁহাদের ছেলেদের নাম বিষ্ণুপুরাণে থাকিলেও যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র

৩২। মহাভারত, ২।৩১।৯।

৩৩। ঐ, ৩।১৩।২৯; ৫।১২৮।৪২।

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র যদি "তামিল প্রবন্ধম্" ৩১৬৮ সংখ্যক শ্লোক দেখিতেন, তো পাইতেন যে, কৃষ্ণ সপ্ত বৃষকে নির্জ্জিত করিয়া পপ্পিনাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন। K. B. Srinivasan, "Some aspects of Religion as revealed by early Monuments and Literature of the South." পৃঃ ৬। ভাগবতে ১০।৮৩।১৩ শ্লোকে সত্যার বিবাহ সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটার বর্ণনা আছে।

সেই ছেলেদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পান নাই, সুতরাং তাঁহারা এবং তাঁহাদের মাতৃগণ কাব্যের অলঙ্কার মাত্র। অনুরূপ যুক্তিবলে তিনি জাম্ববতী ও সত্যভামার অস্তিত্বও অস্বীকার করিয়াছেন। জাম্ববতী ভালুকের মেয়ে, সুতরাং কৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন না, এ কথাও বলিয়াছেন। সত্যভামার বিবাহবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং তিনি বহু স্থলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে।" কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকেও বহিষ্কৃত করিয়াছেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, রুক্মিণী ছাড়া কৃষ্ণের আর কোন পত্নী ছিল না। এত বলিয়াও তাঁহার মনে সত্যভামা সম্বন্ধে কিছু খটকা ছিল; তাই তিনি তৃতীয় খণ্ডের শেষে বিচার করিয়া দেখাইতে চাহিলেন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর গ্রহণ করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন, "ইউরোপ য়িহুদীর নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে বোনাপার্টিকে জোসেফাইনের বর্জ্জনরূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেনরীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না।" যদি কৃষ্ণের একটি ছাড়া স্ত্রীই না থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা নিরর্থক। কৃষ্ণের স্ত্রীরা বন্ধ্যাও ছিলেন না, চিররুগ্নাও ছিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কুলকলঙ্কিনীও বলা চলে না। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রের বিচারে এই সব যুক্তি তোলার কোন সার্থকতা নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের বহু বিবাহ বিচারে ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের সাক্ষ্য আলোচনা করেন নাই। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের নাম প্রথমে (২।৬০।৪১-৪২ বঙ্গবাসী সং, অথবা বোম্বাই সং ১১৫।৪১-৪৩) যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ুপুরাণে অনুসৃত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণ হরিবংশের দ্বিতীয় তালিকার (২।১০৩।৩ এবং ৪ অথবা ১৫৮।৩-৪) কথা জানিয়াও তাহা গ্রহণ করেন নাই। অগ্নি ও মৎস্যপুরাণ দ্বিতীয় তালিকাই অনুসরণ করিয়াছেন। রুবেন অনুমান করেন যে, হরিবংশ যখন লিখিত হয়, তখন মুখে মুখে দুইটি তালিকাই প্রচলিত ছিল এবং হরিবংশকার যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হরিবংশের দুই বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতন রুবেন দুটিকেই অবিশ্বাস্য বলেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র হরিবংশ অনুসরণ করিয়া জাম্ববতীকে ভল্লুকরাজকন্যা বলিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতে তিনি কপীন্দ্রপুত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন[৩৫]। হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা হইলেও উভয়ের বর্ণনায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। হরিবংশ-মতে সম্বর কর্তৃক যে দিন রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন অপহৃত হন, সেই দিনই জাম্ববতীর গর্ভে সাম্ব জন্মগ্রহণ

৩৫। মহাভারত, ১৩।১৪।২৪।

করেন[৩৬]। কিন্তু মহাভারতে আছে যে, সম্বর বধের বারো বৎসর পরে জাম্ববতী কৃষ্ণের নিকট একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, বারো বৎসর তপস্যার পর যেমন কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তেমনি শিবের নিকট তপস্যার পর যেন ঐ পুত্র উৎপন্ন করেন[৩৭]। এই বর্ণনা অনুসারে শাম্ব প্রদ্যুম্ন অপেক্ষা প্রায় ত্রিশ বৎসরের ছোট হন। এই ঘটনা অনুশাসন পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকেই উহাকে পরবর্ত্তী কালের সংযোজন বলিয়া মনে করেন। উহাতে আছে যে, পার্ব্বতী কৃষ্ণকে এক শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিয়াছিলেন[৩৮]। কিন্তু হরিবংশে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র ছিল[৩৯]। বিষ্ণুপুরাণ[৪০], মৎস্যপুরাণ[৪১] এবং অগ্নিপুরাণও[৪২] অনুরূপ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে আছে যে, কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত আট মহিষীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটি করিয়া ছেলে হইয়াছিল[৪৩]। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন ও মন্তব্য করিয়াছেন, "বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।" এই বিদ্রূপ উপভোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে অঙ্ক ও ইতিহাস, দুয়েরই ভুল হইয়াছে, যদিও সেই ভুল না করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি দৃঢ়তরই হইত। ইতিহাসের ভুল এই যে, কৃষ্ণের ১২৫ বৎসর বাঁচার কথা ভাগবতে আছে[৪৪], বিষ্ণুপুরাণের মতে কৃষ্ণ কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন[৪৫]। অঙ্কের ভুল এই যে, জন্মিবার পর অন্তত: ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেহ পুত্রোৎপাদন করিতে পারে না এবং কোন অমিততেজঃশালী ব্যক্তিও এক শত বৎসরের পর প্রজননক্ষমতা বজায় রাখিতে পারেন না। ১২৫ হইতে ৩৯ বৎসর বাদ দিলে বাকী থাকে ৮৬ বৎসর, তাহাতে গড়ে প্রতি বৎসর ২০৯৩টি ছেলে হইলে বা প্রতিদিন গড়ে ৫.৭টি ছেলে জন্মিলে এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মানো সম্ভব হয়। অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কৃষ্ণের কায়ব্যূহ রচনা করিয়া

৩৬। হরিবংশ, ১১০।১।
৩৭। মহাভারত, ১৩।১৪।১২ ইত্যাদি।
৩৮। মহাভারত, ১৩।১৫।
৩৯। হরিবংশ, ২।১০৩।২১-২২।
৪০। বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩২।
৪১। মৎস্যপুরাণ, ৪৭।২১।
৪২। অগ্নিপুরাণ, ২৭৬।৭।
৪৩। ভাগবত, ১০।৯০।৩১।
৪৪। ভাগবত, ১১।৬।২৫।
৪৫। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৭।১৮।

যুগপৎ ষোল হাজার গোপী ও ষোল সহস্রাধিক মহিষীর সহিত বিহারের কথা মানিতে রাজী নহেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণবধে এবং দুর্যোধনের পরাজয় ব্যাপারে কৃষ্ণ যেরূপ কূট কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা মহাভারত ছাড়া আর কোন গ্রন্থে নাই। হরিবংশ ও পুরাণসমূহ হয় ত এ সব ঘটনা সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে চাহেন নাই, অথবা এগুলির আলোচনা তাহাদের পক্ষে হিতকর মনে করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্য হিসাবে স্থাপন করিবার জন্য সুনিপুণভাবে বিচার করিয়াছেন—কোন্ কোন্ ঘটনা সত্য, কোন্ কোন্‌টিই বা প্রক্ষিপ্ত। তিনি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে প্রক্ষিপ্তাংশ বাছিবার কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সূত্র হইতেছে এই যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে যাহার প্রসঙ্গ নাই, তাহা নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক আছে, তাহার হিসাব পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় হইতে লিখিয়া মোট ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাইলেন। তার পর বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্করণে মহাভারতের ও খিল-হরিবংশের শ্লোকসংখ্যা যোগ দিয়া ১,০৭,৩৯০ শ্লোক পাইলেন। তিনি পর্ব্বাধ্যায় সংগ্রহের শ্লোকসংখ্যার সহিত হরিবংশের ১২ হাজার শ্লোক যোগ করিয়া দেখাইলেন যে, পর্ব্বসংগ্রহ লিখিত হইবার পর মোটের উপর এগারো হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।[৪৬] বিংশ শতাব্দীতে যে সুখথঙ্কার মহোদয়কে মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষক পণ্ডিত বলিয়া মানা হয়, তিনি পুণা-সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে লিখিত শ্লোকসংখ্যা এক এক পুথিতে এক এক রকম। পুথিগুলি গোটা বারো বিভিন্ন লিপিতে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুথির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পার্থক্যের হিসাব করিলে তাহার শ্লোকসংখ্যা দাঁড়ায় তের হাজার শ্লোক বা ২৬ হাজার পংক্তি। মহাভারত তাঁহার মতে "is not and never was a fixed rigid text."[৪৭] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক পণ্ডিতেরাও মানিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত, কোন্ অংশ পঞ্চম শতাব্দীর তাম্রলিপিকথিত লক্ষ শ্লোকযুক্ত মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন বহু পুথির পাঠান্তরের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা; আর বঙ্কিমচন্দ্র স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন মূলতঃ তাঁহার নিজের মনগড়া আদর্শের সহিত কোন বর্ণনা বা ঘটনার সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা দেখিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র অনুক্রমণিকাধ্যায়ের সারসঙ্কলনের উপর যতটা জোর দিয়াছেন, পুণার মহাভারতের সম্পাদকগণ ততটা দেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় সূত্রটি—'যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত' মোটামুটি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ সূত্রে তিনি বলেন যে, মহাভারতের রচনার

৪৬। কৃষ্ণচরিত্র, ১।৯, পৃঃ ৩০।

৪৭। মহাভারত 'ভূমিকা, পৃঃ cii বা ১০

বৈশিষ্ট্য যাহার মধ্যে আছে, তাহা মৌলিক ; যাহার মধ্যে নাই, তাহা প্রক্ষিপ্ত। এটি পছন্দ অপছন্দের পর্য্যায়ে পড়ে, তথ্যনির্ভর নহে (objective test নহে, subjective test)। পঞ্চমতঃ তিনি বলেন যে, "শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়" অর্থাৎ যে লোক ভাল, সে কখনও কোন মন্দ কাজ করিতে পারে না। এ যুক্তি অনেকেই মানিতে রাজী হইবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের তিনটি স্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রথম স্তরে ২৪০০০ শ্লোকে পাণ্ডবদের জীবনবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ; দ্বিতীয় স্তরে কবিত্ব তত উচ্চদরের নহে এবং কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত। আর তৃতীয় স্তরে যখন যে-কেহ কিছু ভাল রচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহা মহাভারতে ঢুকাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের মতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়, বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা অধ্যায়গুলি, এবং শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বের বেশির ভাগ এই তৃতীয় স্তরের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে লাসেন মহাভারতের তিনটি স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্তর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্তর প্রায় একই. কিন্তু লাসেনের দ্বিতীয় স্তর হইতেছে—বসু উপরিচরের বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ ; তাঁহার তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইয়াছে পৌলোমাধ্যায় হইতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দশ বৎসর পরে হপ্‌কিন্স তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ The Great Epic of India গ্রন্থে মহাভারতের ক্রমবিকাশের চার স্তর দেখাইয়াছেন। প্রথম স্তরে ইহা ভারতগাথা ছিল এবং কুরুদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪০০ বৎসরের আগে এরূপ ছিল। তাহার পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে ভারতগাথা মহাভারত মহাকাব্যে পরিণত হইল, পাণ্ডবদের কীর্ত্তিগাথা হইল এবং কৃষ্ণ অর্দ্ধদেবতা হইলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ হইতে ১০০ বা ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু উপদেশাত্মক কথা সংযোজিত হইল ও কৃষ্ণ পরমদেবতে পরিগণিত হইলেন। পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে অর্থাৎ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আদিপর্ব্বে অনেক সংযোজন ঘটিল ও অনুশাসন পর্ব্ব শান্তিপর্ব্ব হইতে পৃথক্ হইল[৪৮]। হপ্‌কিন্স বলেন, ভারতে গ্রীক্ বা যবন আক্রমণের পরে যে দ্বিতীয় স্তরের মহাভারত সংগৃহীত হয়, তাহা সুনিশ্চিত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে কৃষ্ণের মহিমাসূচক অংশ সংযোজিত হয় নাই। তাঁহার এই শেষোক্ত মত সকলে মানেন না। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের আন্দাজি তারিখ জোর করিয়া ঘোষণা করেন নাই এবং করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনিই আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে সাহসের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আধুনিক প্রমাণ করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাগ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের আদর্শত্ব স্থাপনের জন্য কৃষ্ণের প্রতি আহত দুর্য্যোধনের তিরস্কারাদি অমৌলিক বলিয়াছেন। পুণা-সংস্করণের মহাভারতে উহা মৌলিক বলিয়া গৃহীত

৪৮। Hopkins—The Great Epic of India. পৃঃ ৩৯৮।

হইয়াছে[৪৯]। বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করেন যে, হয় ত এই অংশ শৈবাদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বেষিগণ লিখিয়াছেন[৫০] এইরূপে যেখানে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পিত আদর্শের সহিত মহাভারতের কোন বর্ণনার পার্থক্য পাইয়াছেন, তাহাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। মহাভারতের পুণা-সংস্করণ প্রকাশের পর পাঠকদের পক্ষে প্রক্ষিপ্ত বিচার করা কিছুটা সহজ হইয়াছে। এখন অতিপ্রাকৃত কিছু থাকিলেই তাহা প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধরিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন যুগে মহাভারতের বিভিন্ন অংশ লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক। তিনি বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতিবশতঃ কৃষ্ণচরিত্রের মতন মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে বাঙ্গালীরা তাঁহার ঐতিহাসিক প্রতিভার যথোচিত সমাদর করেন নাই। তিনি ঐ গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখিলে ভারততত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে তাঁহার আসন চিরস্থায়ী হইত। এখনও যদি কেহ সমালোচনামূলক পাদটীকাদি যোগ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ইংরাজী সংস্করণ প্রচার করেন, তাহা হইলে বিশ্বের বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্কিমপ্রতিভার ঐতিহাসিক দিকের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। অবাঙ্গালী কোন কোন লেখক তাঁহার সংগৃহীত যুক্তি ও প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের লেখা ইংরাজী গ্রন্থ মৌলিকতার জন্য বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।*

৪৯। মহাভারত, ৯ ৬০।২৭-৩৬

৫০। কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ২৬৮।

* লেখকের প্রধান বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বলিয়া বর্ণিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি তুলনা করা যাইতে পারে—

"কেন বঙ্কিম দুটো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেকদিন ধরিয়া পাকা Positivist ছিলেন। Positivist philosophy যাহাই হোক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন Grand man মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন Grand man রহিয়াছেন, যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকোস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে Positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে Grand man করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র।

যাহা হোক, কেন যে দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে তা' ত আমি বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে মিলাইয়া লওয়া যায় না কি? আমার মনে ত কোনও জায়গায় বাধা লাগে না। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে।

* * * *

হয় ত সব দিক হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করিলে নূতন আলো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে ব্রজের কৃষ্ণ ও মহাভারতের কৃষ্ণকে দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা অনাবশ্যক। যদি বাস্তবিক কোনও এমন বিষম অসামঞ্জস্য থাকে যে, কিছুতেই দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহা হইলে অবশ্যই জোর করিয়া মিলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, দুয়ের মধ্যে এমন কিছু অনৈক্য আছে। Positivist religion-এর জন্য যদি আদর্শ পুরুষ দরকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবশ্যকমত শ্রীকৃষ্ণকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া দাঁড় করান কেন চাই, ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

(পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৪ সংস্করণ, পৃ. ২১০—১২)

—পত্রিকাধ্যক্ষ

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনাবলী

রঞ্জিতা কুণ্ডু

(বর্ণমালা শিক্ষাদানে 'হাসিখুসি'র ভূমিকা)

(ক)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ আজও বহু বাঙ্গালী শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত করে। তথাপি এই পুস্তক দুইখানি রচনার পূর্ব্বেও বর্ণমালা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে রচিত কতকগুলি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত বর্ণমালা প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ভাগের রচনাকাল আনুমানিক ১৮৪৯-৫০ সন এবং দ্বিতীয় ভাগের ১৮৫৪ সন। প্রথম ভাগে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া ষত্ববিধি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ পাঠ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটি উপদেশমূলক কাহিনীও পাওয়া যায়।

ইহার পর পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত তিন খণ্ড "শিশুশিক্ষা"র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি কাল্পনিক কাহিনীর সাহায্যে শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিবার প্রণালীর বিপক্ষে ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে বলিয়াছেন,

"কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। এ নিমিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ······প্রভৃতি অবাস্তব বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া, সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।"

চিন্তায় ও কর্ম্মে যিনি যতই অগ্রসরপন্থী হোন্, কাহারও পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে দেশকালের প্রভাবের অতীত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালীর চিন্তাধারারই পরিচয় পাই। ১৮৪৯-৫০ সনের মধ্যে তিন খণ্ড "শিশুশিক্ষা" রচিত হয়। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার যুগ আসিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, দয়ালুতা এবং সমাজ-সংস্কার তাঁহাকে যেরূপ খ্যাতির অধিকারী করিয়াছে, তাঁহার রচিত ক্ষুদ্রায়তন "বর্ণ-পরিচয়" প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ তাহা অপেক্ষা কিছু কম খ্যাতি দেয় নাই। পুস্তক দুইটি এতই বিখ্যাত যে "বর্ণ-পরিচয়" নামটি সব সময় উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। অমুক শিশুটি প্রথম ভাগ পড়িতেছে বলিলে বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ভাগই বোঝা যায়।

এই পুস্তকগুলি এতই বিখ্যাত যে এগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়া ইহাদের পরিচয় দান করিবার প্রয়াস প্রদীপের আলোয় সূর্য্যের দীপ্তি প্রদর্শন করাইবার ন্যায় হাস্যকর।

এই পুস্তকেও দেখা যায় যে, বর্ণমালা শিক্ষাদান করিবার পর দীর্ঘ-দীর্ঘ অনুচ্ছেদে যে সকল পাঠ রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই সে যুগের প্রচলিত রীতি অনুসারে উপদেশ। ইহার সহিত রহিয়াছে সুবিখ্যাত গোপাল ও রাখালের কাহিনী, যে রাখাল নামক দুষ্ট বালকটির দুষ্টামির অন্ত নাই এবং যে গোপাল আদর্শবাদীর স্বপ্নরাজ্য হইতে বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ভাগের পথ বাহিয়া, পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া পরম গম্ভীর মুখে একাকী বসিয়া রহিয়াছে। সে বড়ই একা ; কারণ, তাহার অনুরূপ আর একটিও বালক পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের জীবনবৃত্তান্ত হইতেই জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র পড়াশোনার ব্যাপার ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়েই গোপালের সহিত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের নিজেরও কোন সাদৃশ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগে শিশু-মনস্তত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইত না, বরঞ্চ কারণে অকারণে শিশুকে নীতিশিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্ণপরিচয়ে এই প্রচলিত রীতিই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।

(খ)

"শতাব্দীর শিশুসাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে "বিদ্যাসাগরোত্তর যুগের পথিকৃৎ" বলিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথের প্রথম বালক-পাঠ্য পুস্তক (ইহা সংকলনগ্রন্থ হইলেও ইহার অধিকাংশ রচনা যোগীন্দ্রনাথেরই লেখনীপ্রসূত) ১৮৯১ সনে প্রকাশিত "হাসি ও খেলা" শিশুদের গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য গ্রন্থ হিসাবেই রচিত হয়। "হাসি ও খেলা" প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে, তা স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নেই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণ উপকার হয় না।"

এই হিসাবেই যোগীন্দ্রনাথ নূতন যুগের পথিকৃৎ। এই নূতন যুগ শিশুর সহিত শিশু হইয়া, তাহার সহিত খেলা করিয়া করিয়া শিক্ষা দিবার যুগ ; সহজ কথায় হাসি ও খেলার সাহায্যে তাহার মনকে আকর্ষণ করিয়া তাহার জীবন গঠনের যুগ। সেই যুগের প্রবর্ত্তক যোগীন্দ্রনাথ।

অবশ্য যোগীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেন, এমন নহে। সে কালের কথা বলিতে গিয়া সজনীকান্ত দাস মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতেও (তখন) পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানী ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেষক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়।" ('আত্মস্মৃতি'— সজনীকান্ত দাস, বসুমতী, পৌষ, ১৩৫৮)

এ স্থলে "পরিবেষক" শব্দটি লক্ষণীয়। যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেক শিশু-মনোহর রচনাকে নিজ পুস্তকে স্থান দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ছিলেন ৺নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। নবকৃষ্ণবাবুর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা যোগীন্দ্রনাথ তাঁহার "রাঙ্গা ছবি"তে প্রকাশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ইহা প্রকাশ না করিলে রচনাটি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কবিতাটির নাম 'ভালো ছেলে ও মন্দ ছেলে'। এই কবিতাটিতে বর্ণ-পরিচয়ের রাখাল ও গোপালের ছায়া দেখি। গোপালের ন্যায় ভালো ছেলেটি সোজা পাঠশালায় চলিয়া যায়, সে রাস্তায় কথাও বলে না, খেলাও করে না। অপর পক্ষে মন্দ ছেলে পথে খেলা করিয়া দেরী করে এবং

"পুকুরে ভাসায় জুতা
পাল তুলে দিয়ে।"

ইহার পরের পংক্তিগুলিতে দেখি, পুরস্কারলোভী "ভালো ছেলে"টি কখনও ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া চলিয়াছে, কখনও অঙ্ক কষিতেছে এবং বৎসরশেষে "রাঙ্গা ছবি" পুরস্কার লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিতেছে। এই "ভালো ছেলে"টি গোপালের একটি সমস্বভাব বংশধর। আর মন্দ ছেলে?

"মন্দ ছেলে সারাদিন
ঘোরে হেসে খেলে,
না চায় ছুঁইতে
পায় ছুঁড়ে ফেলে।"

শুধু তাহাই নহে, 'চিক্কণ' বানান করিতে বলিলে সে 'চ'য়েতে আকার বলে এবং শ্লেট হাতে ধরিয়া

"মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়।"

কবিতার শেষ পংক্তি কয়টিতে লেখক এই চঞ্চল বালকটিকে চরম শাস্তি দিয়াছেন; যখন "রাঙ্গা ছবি" পুরস্কার পাইয়া

"ভালো ছেলে খেয়ে চলে
পুলকিত মন,"

তখন বেচারা অন্যমনস্ক, চঞ্চল

"মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া
যেন জানোয়ার,
মাথায় গাধার টুপি—
খাসা পুরস্কার!"

এইরূপে মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া ছাত্রকে শাস্তি দান করিবার প্রথা শিক্ষাব্যবস্থায় "Reign of Terror" বা "আতঙ্কের রাজ্যের" যুগে অনেক বিদ্যালয়েই ছিল। "রাঙ্গা ছবি"তে যোগীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয়, সেটির নাম

'পাঠশালা'। রচনাটিকে ব্যঙ্গ-কবিতাও বলা চলে। আবার সে যুগের বাংলাদেশের একটি সমাজচিত্র হিসাবেও ইহার মূল্য কম নহে। তখন গুরুমহাশয়দের যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল, এ স্থলে তাহারই একটি চিত্র পাই। ছবিতে গুরুমহাশয়ের কানে খাগের কলম গোঁজা, চোখে চশমা এবং হাতে ছড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চেহারাই তাঁহার পরিচয় দেয়। "চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা গুরুমহাশয়"টিকে দেখিলেই মর্কটবংশীয় বলিয়া বোঝা যায়। তাঁহার ছাত্রদের পরিচয়ও রহিয়াছে পরের পংক্তিগুলিতে,

"কানটি মলা খেয়ে ম'ল
গোয়ালাদের গুপী,
টেবির পড়া হয় নি ব'লে
মাথায় গাধার টুপি!"

'গুপী' ও 'টেবি'জাতীয় কুকুরশিষ্য লইয়া যে গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনা চলিয়াছে, তাঁহার প্রতাপ যে কোন ডিক্টেটরকে লজ্জা দিতে পারে। সুতরাং গুপী ও টেবির শাস্তি দেখিয়া,

"আর সকলে ভয়ে ভয়ে
মিটির মিটির চায়,
কার কপালে কি যে আছে
বলা নাহি যায়।"

এই কবিতা বানর ও কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মানুষের শিক্ষাপদ্ধতিকেই ব্যঙ্গ করিয়াছে। "Spare the rod and spoil the child" যে যুগের মন্ত্র ছিল, সে যুগে—

"এক গুরুতে জগত মাৎ—
কাঁপে পোড়োর দল;
মুখে শুধু—'কেঁউ কেঁউ'
চোখে শুধু জল।"

বাধ্যতামূলক ভাবে ক্লাশে বসিয়া পড়িতে [illegible]রা বোধ হয় কোন কালেই ভালবাসিত না। যোগীন্দ্রনাথ হইতে পাঁচ বৎস[illegible] রবীন্দ্রনাথের জন্ম। সুতরাং তাঁহাদের বাল্যকালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চয়ই [illegible]ই প্রকার ছিল। "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশবস্মৃতি হইতে লিখিয়াছেন,—"নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি ইস্কুলে ভর্তি হইলাম।...এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেওয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো,—ইহার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছুই নাই—ইহা খোপওয়ালা একটা বড় বাক্স। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই।...সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যায়। অতএব ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।"

ইহাই উনবিংশ শতকের সপ্তদশকের অভিজাত সন্তানের শিক্ষাজীবনের চিত্র। বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানেরা যে সকল পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিত, তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আর এক পুরুষ পরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "পথের পাঁচালী"তে তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। "পথের পাঁচালী" বহুলাংশে বিভূতিভূষণের আত্মজীবনী। সুতরাং অপুর পাঠশালাটিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিশু-শিক্ষার চিত্র বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হইবে না। "পথের পাঁচালী"র চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে দেখিতেছি, "গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কাণা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়াভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কাণা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।"

সে যুগের গুরুমহাশয়দের কণ্ঠে যেন অবিরাম ধ্বনিত হইত :—"ছাত্রশাসনায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এই রীতি অনুসারেই যোগীন্দ্রনাথের "খেলার গান"এ 'কাজের লোক' কবিতাটিতে মাস্টার নিজের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন :—

"পড়তে বসে ফাঁকি দিলে বিতিয়ে করি লাল।"

গুরুমহাশয়কে ছাত্রদের ভয় এবং তাঁহার পশ্চাৎ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচরণ লইয়া যোগীন্দ্রনাথ কৌতুকও করিয়াছেন। "হাসিরাশি"তে 'শক্তের ভক্ত' কবিতাটির আনুষঙ্গিক চিত্রে দুই দিকে দুইটি করিয়া ছাত্র ছাত্রী লইয়া মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় চশমা চক্ষে দিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। ইহার সহিত ছড়াটি এইরূপ :—

"যখন গুরু দৃষ্টি রাখে পোড়োরা সব ঠাণ্ডা থাকে।"

অবশ্য মাস্টার মহাশয়ের পোষাক এবং বসিবার আসনখানি দেখিয়া মনে হয় যে, এই স্কুল ঠিক প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা নহে। বরঞ্চ যে সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া যোগীন্দ্রনাথ জীবন আরম্ভ করেন, সেদিনের সেই সিটি স্কুলের সহিত এই ইস্কুলের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রহিয়াছে। তবুও শিক্ষার্থীর মনোভাব অপরিবর্ত্তিত।

"যখন গুরু পিছন ফেরে, আড়নয়নে সবাই হেরে।"

তাহার পরের দুইটি চিত্রের পরিচয় এইরূপ :—

"ঢুকলে গুরু ঘরের কোণে দস্যিগিরি জাগে মনে।
তার পরেতে দুড়দাড়, পাড়াশুদ্ধ তোলপাড়।"

ছবিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিতান্তই শিশুরূপে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্রপরিচয়গুলি হইতেই শিক্ষার্থীদের মনোভাব বোঝা যায়। তবে তাহাদের গুরুর দিকে 'আড়নয়নে' চাহিবার ভঙ্গী দেখিয়া এই কথাই মনে হয় যে, তাহাদের দুষ্টামিতে যেন লেখকেরও সহানুভূতি ছিল। বালক যোগীন্দ্রনাথ জয়নগরের গ্রাম্য পাঠশালায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন, কলিকাতায় সিটি স্কুলে পড়াইতে আসিয়া সেই অভিজ্ঞতাকে শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলেন। তাঁহাদের সময়ে আজকালকার মত শিশুমনস্তত্ত্ব পড়িবার প্রথা ছিল না, কিন্তু যে হৃদয় না হইলে শিশুর মনকে বোঝা যায় না, সেই হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়া তিনি সে যুগের বিদ্যার্থি-সমাজের দুঃখ বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয়, "রাঙা ছবি"র যে মন্দ ছেলেটি ;

"মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়"

তাহার প্রতিও যোগীন্দ্রনাথের একটু সহানুভূতি ছিল। পাঠশালা যে শিশুর নিকট বন্দিশালা,

"সেই বেদনা 'তাঁহার' বুকে
বেজেছিল পরম দুখে।"

পড়ায় যে তাহার মন বসে না, সে জন্য কি বালক একলাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই শিশুদরদী যোগীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা। তিনি তাঁহার রচনার সাহায্যে দেখাইলেন যে, লেখাপড়াও সন্দেশের ন্যায় মিষ্টি, মধুর করিয়া তোলা যায়। সেই জন্যই ১৮৯১ সনে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের নামই হইল "হাসি ও খেলা।" বইটিতে শিক্ষা ও আনন্দ একই সঙ্গে বিতরণ করা হইয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথের 'মুখোস' কবিতাটিতে "খোকাবাবু"কে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে,—

"তোমার ত ভাই, মুখোস পরা মানায় না ক ভাল।
চাঁদের মত বিমল হাসি, খেলছে মুখে রাশি রাশি
মুখোস দিয়ে ঢাকবে কেন ঐ স্বরগের আলো।"

যোগীন্দ্রনাথের নিজের বিষয়েও এই উক্তি প্রযোজ্য। শিক্ষকের গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরিয়া যখনই তিনি শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই তাহার অন্তরাল হইতে তাঁহার হাসিমুখ উঁকি দিয়াছে।

অক্ষর-পরিচয় করাইবার যে নীরস রীতি আমাদের দেশে চিরকাল প্রচলিত ছিল, তাহার পটভূমিকায় যোগীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নূতন রীতিকে যুগান্তকারী বলা চলে। "হাসিখুসি"র

"অজগর আসছে তেড়ে,
আমটি আমি খাব পেড়ে"

তাহার দৃষ্টান্তগুণ এবং ধ্বনিমাধুর্য্যে আজও অপাজেয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। "হাসিখুসি"র

অনেক অনুকরণ হইয়াছে এবং তাহাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইয়াছে। "হাসিখুসি"র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ পর্য্যন্ত কোনও বর্ণ-পরিচয়-পুস্তক জয়ী হইতে পারে নাই।

"হাসিখুসি"র এই শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ এই মনে হয় যে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের পরিচয় দিতে গিয়া ঐ স্বল্পপরিসরের মধ্যেই লেখক ২৭টি বিভিন্ন জন্তুর পরিচয় দিয়াছেন। "ৎ"কে লাঙ্গুল বানাইয়া বেড়ালের পশ্চাতে লাগাইবার কৌশলটিও অপূর্ব্ব। আজকাল অবশ্য ইহার অনেক অনুকরণ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার। বস্তুতঃ কোনও কার্য্য করাই কঠিন নহে, কিন্তু প্রথম যিনি উদ্ভাবনাশক্তির পরিচয় দেন, বিশেষ সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য।

সাধারণভাবে হাসিখুসির ছড়াগুলির সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে "ৎ"-এর পরিচয় সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায়। ছড়ার সাহায্যে শিশুকে আর কেহ ইতিপূর্ব্বে বর্ণ-পরিচয় করান নাই। সুতরাং পথিকৃতের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক "হাসিখুসি" আজও এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তক—ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

ইহার একটি কারণ উল্লেখ করিয়াছি। জন্তুজানোয়ারের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ চিরকালীন। সেই জন্তুদের ছবি এবং তাহাদের নামের ছড়া দিয়া যে বর্ণ-পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে, নতুন গুড়ের সন্দেশের মতই তাহা শিশুর নিকট মধুর।

"হাসিখুসি"র আর একটি বিশেষত্ব হইল এই যে, অধিকাংশ বর্ণের পরিচয় দিবার সময়ই লেখক গতিশীল প্রাণীর বা পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। নিতান্ত যে শিশু, যাহার অক্ষর-পরিচয়ও হয় নাই, তাহার চঞ্চল মনে যে লাফাইয়া চলা ছাগলছানা বা সাগরজলে ভাসমান জাহাজ ইত্যাদি যে-কোন স্থিরচিত্রের অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পড়িবার বা ছড়া শুনিবার সময় শরীরটাকে স্থির রাখিতে বাধ্য হইলেও "ঞ"-এ চড়িয়া যে দু ভাই নাচিতেছে, ডুলি স্কন্ধে যে বেহারা যাইতেছে, অথবা যে ঢুলিভায়া ঢোলক বাজাইতেছে, তাহাদের হস্তপদ সঞ্চালনের কথা শুনিয়া বা ছবিতে দেখিয়া শিশুর মন অন্ততঃ মানসিক গতির আনন্দ লাভ করে। অজগর স্থির হইয়া থাকিলে তাহার কথা শুনিতে যতটা আগ্রহ হইত, আক্রমণ করিতে উদ্যত অজগর শিশুর সদাচঞ্চল মনে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক রেখাপাত করে। এই প্রকারই "উট চলেছে মুখটি তুলে" বা "৯-কার যেন ডিগবাজী খায়" এই ছড়াগুলির আকর্ষণ। ডিগবাজী খাওয়া শিশুর একচেটিয়া এবং বড়ই প্রিয় খেলা। সুতরাং ডিগবাজী খাওয়া ৯-কারের ছবিটি তাহার মনে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। অক্ষর চিনিয়া রাখায় আর ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ৯ অবশ্য লুপ্ত অক্ষর; কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের বর্ণ-পরিচয় করাইবার পদ্ধতিটি আমরা স্বরবর্ণের অব্যবহৃত ৯ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অল্পব্যবহৃত "ৎ"র ছড়া হইতে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি।

প্রত্যেকটি বর্ণের ছড়ায় প্রত্যেকটি কথার অর্থ শিশু বুঝিতে পারিবে না জানিয়াও লেখক কখনও বা পশুপক্ষী, কখনও বা গতিশীল কোনও পদার্থের বিষয় বলিয়া তাহাদের

পরিচয় দিয়াছেন। "এক্কাগাড়ী খুব ছুটেছে"র "এক্কা" হয় ত সাধারণভাবে বাংলাদেশের শিশু চেনে না—যানটি বিহার, উত্তর প্রদেশের (সে সময়ের সংযুক্ত প্রদেশ) দিকে প্রচলিত এবং সে স্থানেও এ যানটির প্রচলিত নাম 'টাঙ্গা' বা 'টমটম'। কিন্তু "এক্কাগাড়ী খুব ছুটেছে" এই পংক্তিটি শুনিলে কোন দ্রুত ধাবমান গাড়ীর চিত্র নিশ্চয়ই শিশুর মনে উদিত হয় এবং মনকে আকর্ষণ করে। প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিয়া তাহার রস ভোগ করিতে হইবে—শিশুর সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নহে। শিশু অল্পে সন্তুষ্ট এবং অনেক সময় না বুঝিয়াই রসগ্রহণে অধিক পটু। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই "জীবনস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন,—

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন। সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না, কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।"

যোগীন্দ্রনাথের ছড়াগুলির তৃতীয় বিশেষত্ব হইল দৃশ্যতাগুণ। ইহাতে বিশেষ্যকে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এমন কোনও বিষয় এই ছড়াগুলিতে নাই, যাহার চিত্র অঙ্কিত করা যায় না।

"হাসিখুসি"র বর্ণের ছড়ায় যুক্তাক্ষর যথাসাধ্য বর্জ্জন করা হইয়াছে। "অ" হইতে "ঔ" পর্য্যন্ত সমস্ত স্বরবর্ণমালার পরিচয়ের মধ্যে একবার মাত্র "এক্কা" শব্দে "ক"-এর দ্বিত্ব পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সব শব্দই যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। শিশু "আ"কার, "ই"কার যোগ করিতে শিখিয়াই যাহাতে নিজ হইতে এই ছড়াগুলি পড়িতে পারে, লেখকের সে দিকে দৃষ্টি ছিল।

এই বর্ণের ছড়াগুলির আরও একটি বিশেষত্ব তাহাদের ধ্বনি-মাধুর্য্য। যে শিশু নিজে পড়িতে শিখে নাই, সেও জননীর মুখে,

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
খেঁকশেয়ালী পালায় ছুটি"

শুনিয়া তালে তালে নাচিতে বা দুলিতে থাকে। সুতরাং পশুপক্ষীর বা কোনও গতিশীল পদার্থের নাম উল্লেখ, বিশেষ্যের প্রাধান্য, দৃশ্যতাগুণ, যুক্তাক্ষর বর্জ্জন এবং ধ্বনি-মাধুর্য্য, এই সকল গুণের জন্য "হাসিখুসির" বর্ণ-পরিচয়ের ছড়াগুলি অমর হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় "বর্ণ-পরিচয়" রচনা করিবার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে "হাসিখুসি" রচিত হয়। বর্ণমালা-পরিচিতিকে বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত পথ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টা যোগীন্দ্র-রচনায় পাওয়া যায়। তবে "হাসিখুসি" যাহাদের জন্য রচনা করা হইয়াছিল, তাহারা ঠিক বিদ্যালয়গামী শিশু নহে। সুতরাং

কোন ইস্কুলপাঠ্য পুস্তকের পত্ত অপেক্ষা পল্লীবাংলার ছেলে-ভুলানো ছড়ার সহিতই ইহার ছড়াগুলির অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিশু মাতার নিকট এগুলি প্রথম শুনিবে, ছন্দধ্বনিতে ও রঙীন ছবিতে আকৃষ্ট হইয়া কৌতূহলের বশে জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অক্ষর চিনিবে—ইহাই যেন এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু একটি কথা এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। যে বর্ণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আত্মক্ষরে সেই বর্ণ-সংযুক্ত এক একটি বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়াই "হাসিখুসি"র বর্ণের ছড়া রচিত হইয়াছে। ঐ বিশেষ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ-পরিচয়,' প্রথম ভাগে পাওয়া যায়। যে যে বর্ণাবলম্বী বিশেষ্য "বর্ণ-পরিচয়" হইতে "হাসিখুসি"তে গৃহীত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

স্বরবর্ণ

বর্ণ-পরিচয়—১ম ভাগ	হাসিখুসি—১ম ভাগ
(১) অ—অজগর	অ—অজগর আসছে তেড়ে।
(২) ই—ইঁদুর	ই—ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে।
(৩) ঈ—ঈগল	ঈ—ঈগল পাখী পাছে ধরে।
(৪) উ—উট	উ—উট চলেছে মুখটি তুলে।
(৫) ঋ—ঋষি	ঋ—ঋষি মশাই বসে পূজায়।
(৬) এ—একা	এ—একাগাড়ী খুব ছুটেছে।
(৭) ঔ—ঔষধ খাওয়ান	ঔ—ঔষধ খেতে মিছে বলা।

ব্যঞ্জনবর্ণ

বর্ণ-পরিচয়—১ম ভাগ	হাসিখুসি—১ম ভাগ
(১) ছ—ছাগল	ছ—ছাগলছানা লাফিয়ে চলে।
(২) ট—টিয়াপাখী	ট—টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল।
(৩) ঢ—ঢুলি	ঢ—ঢুলি ভায়া ঢোলক বাজায়।
(৪) ত—তিমি মাছ	ত—তিমি আপন শিকার ধরে।
(৫) ব—বাঘ	ব—বাঘের মত সাহস চোখে।
(৬) ভ—ভালুক	ভ—ভালুক জানে বাসতে ভালো।
(৭) য—যাঁতা	য—যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে।
(৮) ষ—ষাঁড়	ষ—ষাঁড় ছুটেছে পুকুর পাড়ে।
(৯) স—সিংহ	স—সিংহ রাগে কেশর নাড়ে।

সুতরাং ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে ৭টিতে এবং ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ৯টিতে বিশেষ্যগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক হইতেই যোগীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ঐ নাম বা

বিশেষ্যগুলি গ্রহণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাহার পর তাঁহার লেখনীর জাদুদণ্ডের স্পর্শেই বিশেষ্যগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর "আ"কার, "ই"কার যোগে যে ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলির উপর পল্লীবাংলায় প্রচলিত ছেলে-ভুলানো ছড়ার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে ঐ পুরাতন ছড়াগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে ভুলাইয়া তাহার চঞ্চলতাকে শান্ত করা এবং তাহাকে ঘুম পাড়ান। যোগীন্দ্রনাথ-রচিত ছড়াগুলির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথমতঃ "আ"কার, "ই"-কার যোগ করিয়া পাঠশিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ ঐ শিক্ষার সহিত নূতন নূতন শব্দ বা নামের সহিত পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ—আকারের ছড়াটিতে কেবলই ফলের নাম পাওয়া যায়। যথা :—

"শশা আর কলা খাও
খাও পাকা আম,
আনারস ডাব আতা
আর কাল জাম।"

"হাসিখুসি" ভিন্ন যোগীন্দ্রনাথের অপর একটি পুস্তক "হিজিবিজিতে"ও বর্ণের ছড়া পাওয়া যায়; কিন্তু মনে হয় যে, শুধু বর্ণপরিচয় করানই সে স্থলে লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; ওই ছড়াগুলিতে একটু শ্লেষেরও আভাস পাওয়া যায়। যথা :—

"অ আ দু ভাই অজ বেয়াকুব
আসল কুঁড়ের ধাড়ি,
গোঁফ দাড়ি সব পাকলো তবু
বগলে পাততাড়ি।"

"ছড়া ও ছবি"তে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বালক-বালিকার অক্ষরপরিচয় হইয়া গিয়াছে। সেই অক্ষর তাহারা চিনিল কি না, বিচিত্র উপায়ে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। মস্তকে "অ" "আ" ইত্যাদি অক্ষর ওলটপালট করিয়া লেখা, বারটি বালক হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ একটি চিত্রের সহিত যোগীন্দ্রনাথ ছড়া লিখিলেন :—

চেনা

"হাতীর উপর হাওদা দিয়ে
বসলো বার ছেলে,
কেউ বা সোজা, কেউ বা বাঁকা,
ধলো কেউ বা কেলে!
খোকনবাবু ব'ললে হেসে—
'সবাই আমার চেনা,
প্রথম তাদের মধ্যে আছে
পয়সা দিয়ে কেনা!'"

ইহার দু পৃষ্ঠা পরে ব্যঞ্জনবর্ণের বিনাসুতের মোহনমালা পরাইয়া লেখক খোকাবাবুর হাতে খড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(গ)

"হাসিখুসি" দ্বিতীয় ভাগে ছড়ার সাহায্যে ছয়টি ঋতু এবং বার মাসেরও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বার মাসের ছড়াটিকে একটি বালকের শালিক পাখী পোষার কাহিনী বলা যাইতে পারে। বালক বলিতেছে,—

"বৈশাখ মাসে পুষেছিনু একটি শালিকছানা,
জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠল তাহার ছোট্ট দুটি ডানা।"

তাহার পর আষাঢ় মাসে তাহার গাত্রের পালক বৃদ্ধি পাইল এবং শ্রাবণ মাসে তাহার মুখে দুই চারিটি বুলি ফুটিল। এইরূপে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এ অগ্রহায়ণ মাসে ক্রমে ক্রমে তাহার বয়স, বুদ্ধি এবং শারীরিক বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায়। তাহার পর,

"পৌষ মাসে থাকত খোলা খাঁচার দুটি দ্বার,
মাঘ মাসে খেলতে যেত ইচ্ছা যথা তার।
ফাল্গুন মাসে দুষ্টবুদ্ধি জাগল তাহার মনে
চৈত্র মাসে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বনে।"

পক্ষী বা কীট-পতঙ্গ পালন অনেক বালকের অবসর-বিনোদনের একটি বিশেষ উপায়। কোন কোন বালকের ক্ষেত্রে এই খেয়াল আবার কি বিষম খেয়াল হইয়া উঠে, তাহা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত পাঠ করিলে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি তখন পশুপক্ষী পুষিতে বড় ভালবাসিতাম। পুষি নাই—এমন জন্তুই নাই। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, ও সকল তো পুষিয়াছি, পিঁপড়েও পুষিতাম। ফড়িং ও পিঁপড়ে পোষা আমার একটা বাতিক ছিল। তাহাদিগকে অতি যত্নে কৌটার মধ্যে রাখিতাম। ফড়িংদিগকে কচি কচি দূর্ব্বাঘাস খাওয়াইতাম, পিঁপড়েদিগকে চিনি, মধু প্রভৃতি খাইতে দিতাম। পিঁপড়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এতই ভালো লাগিত যে, আমি যখন ৬।৭ বৎসরের ছেলে, তখনো পিঁপড়ে হইয়া চারি হাত পায় পিঁপড়েদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম।"

ইহা একটি বিশেষ বালকের কাহিনী হইলেও ইহা হইতেই বুঝা যায়, সাধারণতঃ বালকেরা পশুপক্ষী পুষিতে এবং তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে কত ভালবাসে। সুতরাং শালিক-ছানার বয়োবৃদ্ধির এবং বুদ্ধির বিবর্ত্তনের কাহিনীর সহিত বালকের বাংলা মাসের নাম মুখস্থ করার কার্য্যটি অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

"ছড়া ও ছবি"তে বারের নাম এবং পক্ষের নামও ছড়ার সাহায্যে শেখানো হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাত বারের ছড়াটি বড়ই মনোহর। ছড়াটি হইল :—

"সোম বারে আনবে ছানা দোকান হতে কিনি,
মঙ্গলেতে পেস্তা বাদাম আনবে কাশীর চিনি।

বুধ বারে চড়িয়ে কড়া, আগুন দিবে জেলে,
বেস্পতিতে ছানা-চিনি মিশিয়ে দেবে চেলে।
শুক্র বারে খুন্তি-নাড়ার টুং-টাং সুর,
শনি বারে চৌদিকেতে সুগন্ধে ভরপুর!
রবি বারে নাইকো পড়া বই রাখো তুলে,
উৎসাহেতে লেগে যাও হাঁড়ির ঢাকা খুলে!"

ইংরাজীতে বারের নাম শিক্ষা দিবার জন্য যে ছড়াটি রহিয়াছে, তাহা যোগীন্দ্রনাথের ছড়াটির সহিত তুলনীয়। সে ছড়াটি এইরূপ:—

Solomon Grundy
Born on a Monday,
Cristened on a Tuesday,
Married on a Wednesday
Ill one Thursday
Worse on Friday
Died on Saturday
Buried on Sunday
That was the end of Solomon Grundy.

বলা বাহুল্য, শিশুচিত্তে যোগীন্দ্রনাথের ছড়াটির আবেদন অনেক অধিক। ইংরাজী ছড়াটির মতই যোগীন্দ্রনাথের সাত বারের ছড়াটি এক হিসাবে একটি আজগুবি ছড়া। কারণ, সাত দিন ধরিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাইলে বালককে যে সুস্থ থাকিতে হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই আজগুবি ছড়াটির সাহায্যে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। বালকের পাঠবিমুখ মনের বিরূপতা দূর করিয়া, তাহার মিষ্টরসলোভী মন এবং রসনা, উভয়কে একই সঙ্গে রসাপ্লুত করিয়া লেখক কৌশলে তাহাকে তাহার অজ্ঞাতে সাত বারের নাম মুখস্থ করাইয়া দিয়াছেন।

শিশুর পাঠারম্ভের ব্যাপারে "হাসিখুসি"র ভূমিকা আলোচনা করিতে গেলে, "হাসিখুসি"র অন্তর্গত 'দশটি ছেলে'র কথা উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শিশুকে যোগ বিয়োগ শিক্ষা দিবার জন্যই "দশটি ছেলে" বা হারাধনের দশটি ছেলে রচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে "হাসিখুসি" প্রথম ভাগে একটি সংয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া শিশুকে সংখ্যাপরিচয় করান হইয়াছে। ঐ সংয়ের পদদ্বয় ১ ও ৯, হস্তদ্বয় ২ ও উল্টা ৩, মস্তক এবং দেহ মিলাইয়া ৪, মুখের "হাঁ"টি ৫, কর্ণ দুটি ৬ ও ৮, একটি চক্ষু ৭ ও আর একটি শূন্য।

ইহার পর বালককে মুখে মুখে বিয়োগ শিখাইবার জন্য 'হাসিখুসি' প্রথম ভাগে এবং যোগ শিখাইবার জন্য "হাসিখুসি" দ্বিতীয় ভাগে "দশটি ছেলে" বা হারাধনের দশটি ছেলের

একে একে হারাইয়া যাইবার এবং পুনরায় একে একে প্রত্যাবর্ত্তনের উপর ভিত্তি করিয়া যে ছড়াগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলি আজ বাংলা প্রবচনে পরিণত হইয়াছে। প্রথম ছড়াটি একটি ইংরেজী ছড়ার অনুসরণে রচিত, কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়া মূলের ইংরেজীত্ব উহাতে থাকিতে পারে নাই।

"হাসিখুসি"র অন্যান্য ছড়ার ন্যায় যোগ বিয়োগ শিখাইবার জন্য রচিত এই ছড়াটিও পল্লীবাংলায় একদা বহু প্রচলিত ছেলেভুলানো ছড়াগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরাতন ছড়াগুলির বিশেষত্ব নির্দ্দেশকালে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ছড়াগুলির ভাবের মধ্যে সংলগ্নতা নাই, ছবি আছে। "হাসিখুসি"র ছড়াগুলির মধ্যে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, আবার ভাবের সংলগ্নতাও যে একেবারে নাই, তাহা নহে। হারাধনের "দশটি ছেলে"র কাহিনীর মধ্যে অতি অনায়াসেই ভাবের সংলগ্নতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বর্ণের ছড়ায় এই সংলগ্নতা অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অজগরের আক্রমণের সহিত আম পাড়িয়া খাওয়ার কোন প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য কল্পনাকে সুদূরপ্রসারিত করিলে বলা যায় যে, অজগরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষারোহণ করিবামাত্র আম্রফলের পক্কতা বালকের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বাপরতা অনেকাংশে লেখকের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। যে অক্ষরটির পরিচয় দেওয়া হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে একটি শিশুমনোহর পংক্তি রচনাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। তাহার সহিত কখনও কখনও অলক্ষ্যে ভাবের পারম্পর্য্য আসিয়া গিয়া শিশুকে শুনাইয়াছে, "ধোপা কেমন কাপড় কাচে, নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁচে।" "টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল" এবং "ঠাকুরদাদার শুকনো গাল" এই দুই পংক্তির মধ্যে বিপরীত রঙের ছবি রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে লেখকের ইচ্ছাকৃত পারম্পর্য্য রক্ষা বলিলে ভুল হইবে।

ছেলেভুলানো প্রাচীন ছড়াগুলির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—"হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে।......ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ, তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।"

সহজ ভাবে সহজ সুরে সহজ ভাষায় ছড়া রচনার এই কার্য্যটি যোগীন্দ্রনাথ অতি অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়াছেন।

এই ছড়াগুলির মধ্যে কতখানি কাব্যরস রহিয়াছে, তুলাদণ্ড ধরিয়া তাহার বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। শিশুর মন ইহাতে অনায়াসে সাড়া দেয়, ইহাই এই ছড়াগুলির সার্থকতা। সে কোন সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড লইয়া বিচার করে না। তথাপি তাহার মন রসপিপাসু বলিলে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। সে ছন্দ শুনিতে চায়, ছন্দের মাধ্যমে ছবি দেখিতে চায়, স্বপ্ন দেখিতে চায়—সে ইতর প্রাণীর কথা শুনিতে

ভালবাসে, মিষ্ট রস আস্বাদনের জন্য তাহার রসনা সর্ব্বদা লোলুপ, আবার শান্তশিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। যোগীন্দ্রনাথের ছড়াগুলির মধ্যে তাহার এই সকল চাহিদার ক্ষুধাই মিটিয়া যায়।

সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখাটাও শিশুর বা বালকের মনে কখনই খুব শক্ত বনেদের প্রাচীর দিয়া গাঁথা হয় নাই। সুতরাং এই সকল ছড়ার সম্ভাব্যতা লইয়া সে বিচার করিতে বসে না। পরম খুসির সহিত সে পড়ে—

"হারাধনের দুইটি ছেলে
বেড়ায় হেসে খেলে;
মাছের পেটে পায় মেছুনি
মাছে গেলা ছেলে!"

অথবা—

"হারাধনের তিনটি ছেলে
ওষুধ নিয়ে আসে;
আছাড় খেয়ে মরা ছেলে
চক্ষু মেলে হাসে।"

বালক ইহা পড়িয়া আনন্দ পায় এবং আপন অজ্ঞাতে তাহার যোগ বিয়োগ শিক্ষা হইয়া যায়।

বালককে নীরস পাঠের রাজ্য হইতে অফুরন্ত ছুটির মজার রাজ্যে লইয়া গিয়া, পড়ার ঘর হইতে খেলার মাঠের পথ দেখাইয়া, কৌশলে লেখক তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষা দান করিবার ছিল, সকলই দিয়াছেন—ইহাই যোগীন্দ্রনাথের লেখনীর জাদু।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দ কৈশোর থেকে শুরু করে দেহরক্ষার অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাব্যরচনা করেছেন, কিন্তু সে ইংরাজীতে। যোগদর্শন, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সবই ইংরাজীতে। ফল এই হয়েছে যে, তিনি যে চমৎকার বাংলা গদ্য লিখেছেন এবং বাংলায় বেশ কয়েকখানা ক্ষুদ্রাকার পুস্তক তাঁর আছে, সে কথা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী ভুলেই গেছেন। তাঁর হাতের বাংলা গদ্য সুগদ্য, উত্তম গদ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীঅরবিন্দের বেশির ভাগ বাংলা লেখা ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যেকার, যে সময়ে তিনি ছিলেন বাংলাদেশে জাতির মুক্তিসংগ্রামের নেতা। 'শ্রীঅরবিন্দের পত্র'—বিখ্যাত তিনটি পত্র স্ত্রীর নিকট লিখিত হয় যথাক্রমে আগস্ট ১৯০৬, ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ও ডিসেম্বর ১৯০৭-এ। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' এবং 'গীতার ভূমিকা'র নিবন্ধগুলি 'ধর্ম্ম' কাগজে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়—১৯০৯-১০ সালে জেল থেকে মুক্তি ও কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে। ঐ সময়েরই রচনা 'জগন্নাথের রথ' ও 'কারাকাহিনী'। 'কারাকাহিনী'র একটি অংশ 'ভারতী'তে, আর একটি পণ্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত 'সুপ্রভাতে' ছাপা হয়েছিল। পুস্তকাকারে বেরোয় ১৯২২ সালে। 'বিবিধ রচনা' নামে যে বইটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৫৫ সালে, তার প্রথম দুটি রচনা পণ্ডিচেরী যাত্রার পূর্ব্বের বলে মনে হয়; বাকীগুলি পণ্ডিচেরীতে লেখা, খুব সম্ভব ১৯১৪-১৫ সালে। ১৯২০ সালে যে একটি দীর্ঘ পত্র—পণ্ডিচেরীর পত্র—শ্রীঅরবিন্দ লেখেন সদ্য আন্দামান ফেরত কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমারের কাছে, সেটি ঐ বছরই সংক্ষিপ্তাকারে 'নারায়ণ' কাগজে এবং পরে পূর্ণাকারে বারীন্দ্রকর্ত্তৃক পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়। তার পর দীর্ঘ ১৪ বছর বাংলা লেখা বন্ধ, ১৯৩৪-৩৫ সালে কয়েকজন সাধিকার প্রশ্নের উত্তরে বাংলায় যে সমস্ত চিঠি লেখেন, সেগুলো দুই ভাগে বেরোয় ১৯৫১ ও ১৯৫৯ সালে।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখার পরিমাণ সত্যিই বেশি নয়, ইংরাজীর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু গুণগত বিচারে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

স্ত্রীর পত্র তিনটি শ্রীঅরবিন্দের ওই সময়কার চিত্তের দর্পণস্বরূপ। ব্যক্তিত্বের প্রকাশেই গদ্য সাহিত্য হয়ে ওঠে। পত্রগুলোর প্রতিটি ছত্রে রয়েছে লেখকের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ, যেমনি বক্তব্য, তেমনি ভাষা—ঋজু বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত। নিজের তিনটি পাগলামি—দেশহিতৈষা, ঈশ্বরলাভেচ্ছা ও দেশকে মাতৃজ্ঞানের কথা বলে লিখছেন, "এখন বলি, তুমি এ বিষয়ে কি বলিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব

পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে?" ইত্যাদি। দ্বিতীয় পত্রের খানিকটা, "তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব, কেবল এই কথাই এখন বলিতে চইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান্ আমাকে লইয়া যাইবেন, সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।" এই পত্রগুলো পড়ে পাঠকমাত্রেই আনন্দ পাবেন।

'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'র দুটি অংশ, প্রথম অংশে গীতা, উপনিষদ্, পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রবন্ধ, সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্বব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশে জাতীয়তা ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি লেখা। বিষয়ের প্রয়োজনে ভাষা এখানে গম্ভীর, গাঢ়বদ্ধ। অনুভূতি ও চিন্তার গভীরতা সমুচ্চ প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কাঠিন্য নেই, শুষ্কতা নেই। আবেগ আছে, কিন্তু সংযত; প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ও পাঠককে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ববোধ ভাব ও ভাষাকে শক্তিময় ও গতিশীল করে তুলেছে, লেখার অন্তরালে লেখকের উপস্থিতিও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। দুটি অংশ, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে-জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তম প্রাবল্যপ্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপর দিকে তামসিক অপ্রবৃত্তিমুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে।" ('মায়া', পৃ. ১৮-১৯)। "আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল, যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত ইউরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিতে প্রয়াসী হই? স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা কি সত্য কথা যে, বাহুবলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ় গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়?" ('আমাদের আশা')। 'সাময়িকী'তে প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলোর আকর্ষণ চিরন্তন, বিদগ্ধ পাঠক এগুলো পড়ে গভীর তৃপ্তি পাবেন। 'গীতার ভূমিকা'র ভাষাও অনুরূপ, যেন ভার একটু কম, সাবলীলতা কিঞ্চিৎ বেশি। গীতা পাঠ করতে গেলেই আধুনিক মনে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা জাগে, তাদের আলোচনা ও সমাধান এখানে মেলে। দু'খানি বই-ই জনপ্রিয় হয়েছে। আমার হাতে রয়েছে পঞ্চম সংস্করণের এক একটি কপি।

আর একটি চমৎকার বই 'জগন্নাথের রথ'। তাতে আছে বিখ্যাত দুর্গাস্তোত্র, এবং আর চারটি রচনা—হিরোবুমি ই'তো, আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়, জগন্নাথের রথ, স্বপ্ন। শেষের দুটির কথাই সংক্ষেপে বলব। 'স্বপ্ন' একটি উপভোগ্য কাহিনী, এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়, ভাষা স্বচ্ছতোয় প্রস্রবণের মত ছুটে চলে, অথচ এর মধ্য দিয়ে লেখক কর্ম্মফল পাপ-

পুণ্য, সুখদুঃখের তত্ত্ব, সবই পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। ভাষার নমুনা : "হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে আলো দেখাইয়া বলিল, 'দেখ কি এনেছি।' সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'এলি? এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক, এলি তো বোস, আমার সঙ্গে খা।'" 'জগন্নাথের রথ' একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রজ্ঞাবান্ শক্তিমান্ লেখক যে কত কম কথায় কত বেশি বলতে পারেন, এটি তার উদাহরণ। চৌদ্দ পনের শ' শব্দের মধ্যে বলতে গেলে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গোটা সমাজদর্শনকে তুলে ধরেছেন। সংসারকে জগন্নাথের রথ, তথা ভগবানের লীলানিকেতন কি ভাবে করে তোলা সম্ভব, তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। অথচ লেখাটি ভারী নয় এবং বেশ কয়টি ছবিতে উজ্জ্বল। মনুষ্যসমাজের তামসিক রূপটি : "মলিন পুরাণ কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুর গাড়ী টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে ; একজন ময়লা কাপড়-পরা ভুঁড়ি-সর্ব্বস্ব শ্লথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান ঘ্যান শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহঙ্কার।" সাধারণভাবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষার ভিত্তি বঙ্কিমের রচনাবলী, বঙ্কিম তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায় বঙ্কিমী রীতির প্রতিধ্বনি মেলে না ; মানসিকতার মৌলিকতা তাঁর বাচনভঙ্গিকেও করে তুলেছে সম্পূর্ণ স্বকীয়।

'কারাকাহিনী' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রচনা। বিচার সাপেক্ষে পুরো এক বছর (মে ৪, ১৯০৮—মে ৫, ১৯০৯) শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে অন্তরীণ ছিলেন। অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের কারাবাস নয়, একেবারে খুনী আসামীদের ব্যবস্থা। অল্পদিন ছাড়া গোটা বছরটাই কাটে নির্জ্জন লোহার গারদে। কিন্তু কারাকাহিনী দুঃখের কাহিনী নয়, দুঃখ কি ভাবে উপভোগ করেছেন, তারই ইতিহাস—যোগী শ্রীঅরবিন্দের অন্তরের ছবি ;—"বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস।" ব্যক্তিগতভাবে কোন দুঃখই তাঁকে স্পর্শ করে নি, কিন্তু মানবতার লাঞ্ছনায় তিনি বেদনা বোধ করেছেন। তাই কৌতুকের মধ্যেও দেখি কটাক্ষ—'সভ্য' ব্রিটিশ রীতির প্রতি। "বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটীতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটীতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটীতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল। সেই বাটীতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব।" জেলের আহার, পাহারার ব্যবস্থা, চিকিৎসা, সব কিছুরই সরস কৌতুককর বর্ণনা পাই। কতকগুলো চরিত্রও অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে চিত্রিত হয়েছে। বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ক্ষীণপ্রাণ জেলার যোগেন্দ্রবাবু, মৌলবী শামস্-উল-আলম ডিটেকটিভ অতি বাস্তব চরিত্র। ডিটেকটিভের শিকার কৌশল—"এই মহাত্মা নিজের জীবনচরিতের একটি পাতা আমাকে

খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, 'আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটি অতি মূল্যবান্ উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, 'সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূলমন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।' ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন।"

কারাকাহিনীর আর একটা দিক্ হল বিচারের প্রহসন। এখানেও অনেক মজার বর্ণনা আছে। "নর্টন সাহেব (সরকারী ব্যারিস্টার) ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, সংলগ্ন অসংলগ্ন, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ যাহা পাইতেন, একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর Suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে, শেকস্‌পীয়র ডেফো ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাসলেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর শয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান্ ও প্রভাবশালী bold bad man, আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা পাতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংহারপ্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, 'অরবিন্দ ঘোষ।' সেসন্স আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টনকৃত plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচ্‌ক্রফট (সেসন্স জজ) হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে না কেন?" ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তি লক্ষণীয়। কারাকাহিনীতে অন্যান্য বিপ্লবীদের নির্ভীক নিরুদ্বিগ্ন ছবিও পাই। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

'বিবিধ রচনা'—এটি পূর্ণতার আদর্শ, উপনিষদে পূর্ণযোগের কথা এবং বেদের মর্ম্মার্থ বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন। দর্শন ও তত্ত্বের আলোচনা, অথচ খুবই স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। Arya কাগজে যে সময় Secret of the Vedas লিখছিলেন, সে সময়ে বাংলাতেও বেদের মর্মকথা ও অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন। "এই সকল বেদতত্ত্ব বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মুখ্যকথা সংক্ষেপে বলিব।" এই অভিপ্রায় পূর্ণ হলে বেদের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচয় সহজ হত। এমন পরিষ্কার অনুবাদ—"অগ্নিকে ভজনা করি, যিনি যজ্ঞের দেব, পুরোহিত, ঋত্বিক্ হোতা এবং আনন্দঐশ্বর্য্যের বিধানে শ্রেষ্ঠ।"—বাংলায় নেই। তা ছাড়া বেদের তাৎপর্য্য যদি হয় অর্দ্ধসভ্য মানুষের প্রকৃতিপূজা অথবা পার্থিব ভোগসম্পদের জন্যে

যজ্ঞীয় প্রার্থনা, তবে ওগুলোতে মন নিবিষ্ট করার উৎসাহ থাকে না। "বেদসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্ব্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘনকণ্টকময় অরণ্যে পুষ্পিত বৃক্ষলতা ও গুল্মের বিচিত্র আবরণে আবৃত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার গতি, অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরণের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত।"—এ পণ্ডিতি বাংলা নয়, শিল্পীর হাতের রচনা।

'পণ্ডিচেরীর পত্রে' আবার শ্রীঅরবিন্দকে অন্তরঙ্গ ভাবে পাই। ভ্রাতার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁর দর্শন ও যোগের এবং জীবনের মহান্ ব্রতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার দিকে যেন নজর নেই, প্রচুর ইংরাজী শব্দের ব্যবহারে তাই মনে হয়। কিন্তু এতে করেই লেখায় এসেছে একটা তীক্ষ্ণ ঋজুতা। "তুমি বলছ—চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম; স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম, সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভকর পরিণাম হবে? আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে চাই বিশাল ধীর সমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় অবিচলিত শক্তি, শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, এক শ ক্ষুদ্র আমিত্ব-শূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের লুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎজীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।"

এই পত্রে এবং পরবর্ত্তী লেখা 'পত্রাবলী'তে শ্রীঅরবিন্দ ভাষায় চলতি রীতির ব্যবহার করেছেন। সাধু চলতি কোন রীতির লেখাতেই কলাকৌশল প্রকট নয়। স্বচ্ছতা ও ঋজুতাই এই লেখার বৈশিষ্ট্য।

পত্রাবলীতে আবার অন্য সুর। এই পত্রগুলিও ব্যক্তিত্বময়, কাজেই সাহিত্য। কিন্তু এ ব্যক্তি একেবারে অনন্য। শিষ্যাকে ভরসা দিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, সহানুভূতি আছে, কিন্তু তবু যেন মনে হয়—অনেক দূরের মানুষ তিনি, হিমালয়ের স্তব্ধতা ও মহিমা তাঁর। তিনটি পত্রখণ্ড উদ্ধার করা যাচ্ছে। "ভীত বা বিচলিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, অন্ধকারের অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়, অন্ধকারেও শান্ত হয়ে থাক।" "এটা খুব বড় opening—সূর্য্যের জ্যোতি যে নামছে, সে সত্যের জ্যোতি, সে সত্য ঊর্দ্ধ মনেরও অনেক উপরে।" "এইরূপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন ঊর্দ্ধের চেতনা নেমে মনপ্রাণকে অধিকার করবার জন্য তৈয়ারী করছে, আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার প্রথম স্পর্শে একটি বিশাল শান্ত শূন্যতাই হয়, তার পর সে শূন্যতার মধ্যে একটি বিশাল গাঢ় শান্তি, নীরবতা, স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে।" এ নৈর্ব্যক্তিক সত্যভাষণ মাত্র নয়, ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতেই লেখাটির গুরুত্ব। কিন্তু ব্যক্তি রয়েছেন যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, জনৈক ইংরাজ সমালোচক সত্যই লিখেছেন, "He writes as though he were standing among the stars, with the constellations for his companions." (তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় যেন তিনি রয়েছেন তারকারাজির মধ্যে, ওরাই তাঁর সঙ্গী।)

রাঢ়ে ধর্মপূজা

অমলেন্দু মিত্র

ধর্মঠাকুর রাঢ়ের বিশিষ্ট গ্রাম দেবতা। এই দেবতার পূজানুষ্ঠানের ভিন্নমুখী বৈচিত্র্যের সঙ্গে অন্য কোন পূজানুষ্ঠানের তুলনা হয় না। সেই জন্য ধর্মঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ কি তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। এ কাজ করতে গেলে রাঢ় অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের ধর্মপূজা ও অন্যান্য দেব দেবী নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ডের কথা সংগ্রহ করা দরকার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হয়েছি। এখানে কয়েকটি গ্রামের ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব ও গ্রামস্থ অন্যান্য দেব দেবীর কথা প্রকাশ করা হল—

১। **কৃষ্ণপুর**, থানা খয়রাশোল (বীরভূম)

বুড়োরায়

এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের মূর্তি শিবলিঙ্গের মত। নাম বুড়ো রায়। গ্রামের মধ্যস্থলে মাটির ঘর, টিনের ছাউনি। সামনে নাট মন্দির আছে। ধীবর সম্প্রদায় মূল দেয়াশী। পাট-দেয়াশী সদ্গোপ। পুরোহিত আচার্য ব্রাহ্মণ। আনুমানিক ৫০০ বছর পূর্বে এই ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিংবদন্তী আছে যে বহু

স্বপ্নাদেশ

বৎসর আগে ধীবরদের উপর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় নিকটস্থ অজয় নদীর গর্ভ থেকে দেবতা নীত হন। মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। নিত্য পূজাও আছে।

মন্ত্র

বীজমন্ত্র :—"ধুং ধর্মরাজায় নমঃ"

ধ্যান :—"যস্যান্তং......শূন্য মূর্তিং" (ধর্মপূজা বিধানের ধ্যান মন্ত্র অনুযায়ী)

ঘট স্থাপনা

বৈশাখমাসে মূল পূজার আটদিন আগে ঘট স্থাপন করে বিশেষ পূজা শুরু হয়। বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন ভক্ত্যাবৃন্দ ক্ষৌর কর্ম সাধন করে ব্রতী হয়। ভক্ত্যাবৃন্দ উপবাস করে চতুর্দশীর দিন অপরাহ্নে কাষ্ঠ নির্মিত বাণেশ্বরকে পূজান্তে ছুরি উৎসর্গ করে, উক্ত ছুরি পুরোহিতের নিকট গ্রহণ করে গলায়

উত্তরীয় ধারণ

ধারণ করে তারপর বাণেশ্বরকে মহাসমারোহে ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্য বাদন সহ নিকটস্থ অজয় নদে স্নান করাতে নিয়ে যায়। স্নানের পর পাট-দেয়াশীদ্বয় দুটি পূর্ণ কলস (পুরকলসী) নদীর ঘাট থেকে দেবমন্দিরে নিয়ে যায়। আসার সময় ভক্ত্যারা "চলো বাবা বুড়ো রায় হে" ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে

পুরকলসী

বাণেশ্বরকে পুরোহিতের কোলে বসিয়ে পুরোহিতকে কাঁধে তুলে নাচতে নাচতে দেবমন্দিরে প্রত্যাগমন করে। নদী থেকে ফেরার সময় ছড়া ও পাঁচালী গাওয়া হয়। মন্দিরে আসার পর মূল ধর্মঠাকুরের মূর্তিটি নিয়ে গ্রামের

বাইরে বড় পুকুর নামক পুকুর থেকে অনুরূপভাবে স্নান করিয়ে আনে। রাত্রিবেলা ধর্মঠাকুরকে মন্দিরের বাইরে স্থাপন করে ভক্তবৃন্দ চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করে "চলো বাবা বুড়ো রায় হে," "চলো বাবা ধর্মরাজ হে" ইত্যাদি ধ্বনি তুলে সারারাত নাম ডাক করে। অন্যদিকে ভক্ত্যারা পালা করে কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি দেয় ও আগুন নিয়ে খেলা করে। শেষরাত্রে ভক্ত্যারা হোলাভিজা ও ফল ভক্ষণ করে। পূর্ণিমার দিন অনুরূপভাবে ধর্মঠাকুরকে স্থানীয় বড় পুকুর নামক পুকুরে স্নান করিয়ে মন্দিরে আনা হয়। দুপুর বেলায় ষোড়শোপচারে বিহিত পূজার পর ছাগবলি দেওয়া হয়। রাত্রে ভক্ত্যারা গাড়ী বানানো সম্পন্ন করে। দুই জোড়া গোগাড়ীর কাঠামো দিয়ে মধ্যস্থলে দুটি খুঁটি পোঁতা হয়। খুঁটি দুইটির মাঝের কাঠটিতে দুটি দড়ির ফাঁস তৈয়ারী থাকে। গাড়ীটিতে চারটি চাকা লাগানো হয়। ঐ দড়ির ফাঁসে পাট-দেয়াশী পা গলিয়ে হেঁটমুণ্ডে ঝোলে। খুঁটির পাশে দুজন ভক্ত্যা পাট-দেয়াশীকে ঝুলতে সাহায্য করে। নদী থেকে এই ক্রিয়া শুরু হয়। পাট-দেয়াশীর মাথা নদীর দিকে থাকে। সেই দিকের গাড়ীর প্রান্তে পুরোহিত ফুল, বেলপাতা নিয়ে বসে থাকেন। অপর প্রান্তে থাকে অগ্নিকুণ্ড। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে ঝুলন্ত পাট-দেয়াশীর হাতে ফুল, বেলপাতা ধরিয়ে দেন। ঝুলন্ত দেয়াশী মন্ত্র উচ্চারণ করে সেগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। গাড়ীকে ঠেলা দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। এই হল গাড়ী বানানো। রাত্রে ভক্ত্যারা ফলাহার করে।

নিশাজাগরণ

কাঁটা ও আগুনখেলা

গাড়ী বানানো

প্রতিপদের দিন ভক্ত্যারা স্নানান্তে ডুরিগুলি খুলে বাণেশ্বরের লৌহশলাকায় আটকিয়ে পূর্ণ কলসের নিয়মজল নিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করে। দুপুরে ভক্ত্যা ভোজন হয়। আগে গাজনে চড়ক খুঁটির সাহায্যে ভক্ত্যারা পাক খেতো। এখন আর এ অনুষ্ঠান হয় না। তবে চড়কতলায় ভক্ত্যারা আগুন নিয়ে চারিদিক পাক খায়। গাজনের দিন অগ্নিকুণ্ড করা হয়। তারপর সেই আগুন হাতে তুলে আগে ছোড়াছুড়ি করে। বানকোঁড়া হত। এখন হয় না।

বাণেশ্বরকে উত্তরীয় প্রদান

চড়ক

চতুর্দশীর দিন বাণেশ্বরকে স্নান করাবার আগে প্রথমেই এই গীত গেয়ে গাজন বাঁধা হয়—

গাজন বন্ধন

দেববন্দ দেয়াশী বন্দ
ঘাট পাট লাঠি বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর গান।
ডাইনে ঠাকুর বন্দ
বামে বীর হনুমান।
পশ্চিমে গদাধর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর

তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
উত্তরে কামাখ্যা দেবী
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
পূবে ভানু ভাস্কর
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।
দক্ষিণে জগন্নাথ দেব, পাতালে বাসুকি নাগ
স্বর্গে নারায়ণ
তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।"

এইভাবে চারিদিকের দেবতাদের বন্দনা করা হয়। বাণেশ্বরকে স্নান করানোর পর মুল দেয়াশী অন্যান্য দেয়াশীসহ চামর ঢুলিয়ে এই চালান পাঁচালীটি গাইতে গাইতে খোল করতাল বাজিয়ে স্নানের ঘাট থেকে পূজা মণ্ডপে নিয়ে আসেন—

চালান গান

"আদ্যি নামে ছিলেন ধর্ম পুরুষের জনম,
তাঁর পুত্র হলেন গোঁসাই অনাদি ধরম।
অনাদির অধিপতি হরিষ জগত
হস্তপদ নাই প্রভু ভ্রমিয়ে আকাশ।
না ছিল জলস্থল এ মহী মণ্ডল
এ তিন ভুবন ছিল সব শূন্যময়।
শূন্যতে আসন প্রভুর শূন্যতে বসন।
শূন্যভরে ভ্রমণ করেন ধর্মনিরঞ্জন।
শূন্যতে থাকিয়ে প্রভু পাতিলেন মায়া,
আপনি সৃষ্টি করিলেন আপনার কায়া।
শূন্যতে থাকিয়ে প্রভু নিঃশ্বাস ছাড়িল।
শূন্যের নিঃশ্বাসে প্রভু উল্লুক জন্মিল।
জন্মিয়া উল্লুক প্রভু হয়ে গেল বক্তা
উল্লুকের পৃষ্ঠে প্রভু দিয়ে দুই পা।
কহ বলি উল্লুক কত যুগ গেল রয়ে।
চার চৌদ্দ যুগ গেল এ ব্রহ্মা ধেয়ানে।
অনি (?) সত্যযুগ সৃষ্টি করেন ধর্মনিরঞ্জন
বিল (?) হইল প্রভু কাঁপে থরথর।
জলদান দাও যদি ধর্ম যোগেশ্বর।
পৃষ্ঠে করি বইতে পারি দ্বাদশ বৎসর।
সে কথা শুনিয়ে মুখে অমৃত ভাসিল,
কিছু না খাইল কিছু নিঃশ্বিয়ে ফেলিল।

শূন্যকার ছিল পৃথিবী জলময় হইল,
হাতের তুড়িতে জলে বাধিল বিমুখ
তাহে ভর করে দেখ অনাদির উল্লুক।
ছিঁটিয়ে ফেলিল ধর্ম কাঁধের কনক পৈতা,
জন্মিল অনন্ত নাগ সহস্র তার মাথা
শুন বলি অনন্ত নাগ তোমায় দিলাম বর
আজ হৈতে হইলে তুমি অক্ষয় অমর
ইহাই পণ্ডিত বলি তিন ডাক দিল
তিন ডাক লয় প্রভু, তিন অবতার
শ্রীধর্ম পূজিলাম আজি জয় জয়কার।

আবরণ দেবতা

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আছেন মনসা ও পঞ্চানন। বাবা গোঁসাই নামে একজন ব্রহ্মচারীও আছেন।

গ্রামে অজ্ঞাত দেব দেবী

রাঙামেটের গোঁসাই—বাউরীদের পূজা। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে। গ্রামের বাইরে সজ্জী মাঠের পাশে একটি ঝোঁপে শিরিষ ও বেলগাছের নীচে এঁর আটন। কথিত হয়, রাত্রে ঐদিকে কেউ গেলে গোঁসাই নানারূপ মূর্তি ধারণ করে দেখা দেন। এঁর সঙ্গে কালীরও আটন আছে। কার্তিক অমাবস্যায় এই কালীর পূজা হয়।

ঘুরঘুরে কানালীর মাঠের গোঁসাই—১লা মাঘ বেদীতে এই গোঁসাইএর পূজা হয়। কথিত হয় ভক্তির অভাব ঘটলে চাষীদের ইনি নানাভাবে বিব্রত করেন।

মোল(মহুয়া)তলার গোঁসাই—গ্রামের বাইরে কৎবেলের গাছে এঁর আশ্রয়। ১লা মাঘ পূজা হয়। কেউ মানত করলে মঙ্গল বা শনিবার পূজা ও ভোগ হয়। এ পূজাও বাউরীদের। ধীবর সম্প্রদায়ও নিকটস্থ বিলে মাছ ধরার আগে পূজা ও ভোগ দেয় এবং মানত করে।

নিমতলার গোঁসাই—ডোমদের পূজা। তারা বিশ্বাস করে এই গোঁসাই তাদের ইষ্টদেবতা। তাঁর কৃপায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। কারও অসুখ বিসুখ হলে ঐ গোঁসাই-এর নিকট মানত করলেই সেরে যায়। শনি ও মঙ্গলবার পূজা। ছাগল ও মুরগী বলি হয়।

বেলতলার ব্রহ্মচারী—ধীবরদের পূজা। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পূজাদি দিলে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন। কথিত আছে ইনি কারও অনিষ্ট করেন না। তবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করলে বিভিন্ন মূর্তিতে রাত্রে লোককে ভয় দেখান।

তালতলার গোঁসাই—ধীবরদের পূজা। মঙ্গল ও শনিবার পূজা হয়।

নিমপালের গোঁসাই—ব্রাহ্মণের পূজা। শনি ও মঙ্গলবার পূজা হয়। অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে লোকবিশ্বাস। মাঠে ইনি থাকার জন্য কেউ ধান চুরি করতে সাহস করে না। প্রতি শনি ও মঙ্গলে কেউ না কেউ পূজা দেনই।

২। মামুদপুর, থানা খয়রাশোল (বীরভূম)

এখানকার ধর্মঠাকুরের শিলাগুলি স্তুপাকৃতি, থাক্ থাক্ ভাবে সাজানো। ধর্মঠাকুরের

বুড়ো এবং কানা রায়

দুটি নাম, বুড়ো রায় এবং কানা রায়। পাথরের বেদীর উপর সাজানো। মাটির ঘর, টিনের ছাউনি। সামনে বৃহৎ তমাল গাছ। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত।

ধীবর দেয়াশী

দেয়াশী ধীবর সম্প্রদায়ের। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মূল পূজা হয়।

ধ্যানমন্ত্র

"নমঃ নমঃ পুষ্পায় নমঃ।" "ধাং ধুং ধর্মরাজায় নমঃ"॥

পূজার প্রথমদিন বারো মুঠ ছোলা ভিজিয়ে দেবতার শীতল হয়। দ্বিতীয় দিন বানামো। ভক্ত্যারা বাণেশ্বরকে ঘোষপুকুরে স্নান করান। ভক্ত্যারা

বারোমুঠি ছোলার শীতল

বাউরী, ধীবর ও সদ্গোপ। সংখ্যায় ২০।২৫ জন। স্ত্রীলোকও থাকে। রাত্রিতে গাজনের ঢাকবাদ্য বাজানো হয়। ভক্ত্যারা দেবতার সামনে গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। তারপর ধূপ নিয়ে

ধূপঘ্রাণ

ধূপঘ্রাণ ভক্ত্যাদের দেওয়া হয়।

গাজনের শ্লোক

শ্লোক

"দেববন্দন, দেয়াশী বন্দন
খাট পা লাঠি বন্ধন
আর বন্ধন সরস্বতীর গান
ডাইনে ডাকুর বন্ধন
বামে বীর হনুমান।
গাজনে যে বাবা আছেন, তাঁর চরণে প্রণাম।"

চালান গান

ভাঁড়াল আনবার জন্য শুঁড়িবাড়ী যাওয়া হয়। শুঁড়ি ধর্মঠাকুরের জন্য পচাই মদ তৈরী করে রাখে। ভাঁড়ে মদ নিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসা হয়—

"ও শুঁড়ি ভাইয়ারে তোমার সকল জীবন
তোর ঘরে খেলা করে বাবা ধর্ম নিরঞ্জন।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা কটুকে কহিবে
পূজা পুত্র কেটে দিয়ো বলিদান হে।

আদি নামে ছিলেন গোঁসাঞী বাবা পুরুষের জনম।
ভাল তার পুত্র হন অনাদি ধরম
তোমার ধবল মাথা ধবল ছাতা ধবল মাথার কেশ
কাঞ্চনরূপে বাবা নবীন বয়েস।
এসো হয়ু বসো খাটে, তুমি বাটার তাম্বূল খাও
দেশের খবর এনে তুমি ধর্মকে জোগাও।"

তারপর মণ্ডভাণ্ড ধর্মঠাকুরের গৃহের বাইরে স্থাপন করে বলতে থাকে—

"একেত ধর্মের ঘর দেখে লাগে বড় ভয়
কটুকে যোগাও ভাণ্ডার হে"

মাথায় প্রদীপ

সন্ধ্যার সময় বানামো, আগুনের ফুল খেলা, কণ্টকারী কাঁটায় গড়াগড়ি এ সমস্ত অনুষ্ঠান হয়। কোনো কোনো ভক্ত্যা জিহ্বা ফুঁড়ে মাথায় প্রদীপ নিয়ে বাবার ধামে হাজির হয় ও নাম ডাকে।

ধর্মের গাজনে নিম্নলিখিত পাঁচালী গাওয়া হয়—

পাঁচালী

"চারিদিকে ভেলে দেখ বাবা, তোমার পূজার আয়োজন
পুষ্পের ভিতরে খেলা করে বাবা দেব নিরঞ্জন।
অনাথের অধিপতি জগতে হল্পিবে বাবা
হস্তপদ নাইরে বাবা নিরাকার প্রাণী
এসেছো কি-না এসেছো বাবা করি ভালাভালি।
ভর না আসিলে বাবা খাবে গালাগালি।
ব্রহ্মা বলেন মধু খেয়ে বাবা শিব ক্ষেপা হল
ছত্র কোলে করে বাবা নাচিতে লাগিল।"

এই ধর্মঠাকুরের কোন বলি বর্তমানে নাই। জয়দেব কেন্দুবিল্বের একজন মোহান্তের অধীনে থাকায় বলিদান বন্ধ হয়ে গেছে।

মনসা

ধর্মঠাকুরের দক্ষিণে মনসা আছেন।

গোঁসাই ও মা জানা-বুড়ি

গ্রামের নিমতলায় আছেন গোঁসাই। শনি মঙ্গলবার মালসা ভোগ দেওয়া হয়। মা জানা-বুড়ির একটি স্থান আছে। মাঘের ১লা একদিনের জন্য মেলা বসে এবং অনেক পাঁঠা বলি হয়। জানা-বুড়ির বেদীর কাছে মাটির ঘোড়া মানত করা হয়।

৩। মালাবেড়িয়া, থানা সাঁইথিয়া (বীরভূম)

এই গ্রামে ধর্মঠাকুর দুই স্থানে অবস্থিত। একটি দেবাংশীদের বাড়ীর সন্নিকটে নিমগাছ তলায়। এঁর পূজা দেবাংশীরা নিজেরাই করে। অপরটি গ্রামের উত্তর দিকে হাড়িদের

বাড়ীর নিকট ধর্মপুকুর নামক পুকুরের পাড়ে পাকা ঘরে অবস্থিত। এঁর পূজা করেন রায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ। উভয় স্থানে ঠাকুরের মালিক ঐ দেবাংশীরা। দুই স্থানে শিলাখণ্ড ও কাঠের ঘোড়ায় পূজা হয়। পাকা ঘরের বেদীতে পাঁচটি শিলাখণ্ড আছে। তিনটি গোলাকৃতি, একটি কূর্মাকৃতি, একটি বাঁশীর মত। নাম—বুড়োরাজ, পৈঠদেব, মৎস্যরাজ, বেণুদেব ও কূর্মদেব। ধর্মবেদীর কাছে একটি প্রস্তর স্তূপ আছে। দেবাশীদের উপাধি দে (মণ্ডল) এবং দেবাংশী (রাজপুত)।

ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন নাম

মূল পূজা হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। রাজপুত, হাড়ি মুচি প্রভৃতি জাতির লোক ভক্ত্যা হয়। সংখ্যা অনির্দিষ্ট। ফলভাঙা অনুষ্ঠান আছে। আগুন খেলা হয়। বাণ ফোঁড়া নেই। পূর্ণিমার দুদিন আগে থেকে ফলমূলাহারী থেকে ভক্ত্যারা স্নান না করে পূর্ণিমার আগের দিন বিকালবেলা ক্ষৌরকর্ম শেষ করে দলবদ্ধ ভাবে হাতে একটি করে পাঠকাঠি নেয়। তারপর ছড়া গাইতে গাইতে ঢাক ঢোলের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে পুকুরঘাটে এসে উপস্থিত হয়—

ছড়া

"বেতো ধরমের পুজো রে ভাই, বেতো ধরমের পুজো
বাত সারিয়ে মোদের ধরম হয়ে গেল কুঁজো।
কত লোকের বাত সারালেন নিজের বেলা ছাই।
হয়ত নিজের ওষুধ রে ভাই খুঁজে পায় নাই।
মোদের কথায় বুড়ো ধরম রাগ কোর না,
বুড়ো বয়সে রেগে যেন চলে যেয়ো না।
বিশ্বাস নেই তোমায় ওগো স্ত্রীহীন ধর্মরাজ
স্ত্রীহীনদের অসাধ্য যে নাই কো এমন কাজ।"

রোগ আরোগ্য

(আষাঢ় মাসের প্রথম রবিবার এই গ্রামে ধর্মঠাকুরের কাছে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বাতরোগীর সমাবেশ হয়। অন্যান্য রবিবারেও আসে। লোকসঙ্গীতটিতে এই বিষয়েরই প্রতিফলন।)

তালের গুঁড়ি জাগানো

এরপর দশ হাত লম্বা একটি তালগাছের গুঁড়িকে ধর্মঠাকুরের আরোহণের রথ মনে করে পুকুরের মধ্যে লক্ষ্য রেখে সকলে চীৎকার করতে থাকে, 'ঐ আসছেন, ঐ আসছেন' বলে। গুঁড়িটি কিন্তু যেখানকার সেখানেই থাকে। ভক্ত্যারা ঐ গুঁড়ির উপর বসে সমানে চীৎকার করে চলে। তারপর যখন 'এই এসেছে' বলে উঠে পড়ে গুঁড়িটি সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে। এরপর দোলাতে করে ধর্মঠাকুরকে মন্দিরে আনা হয়। পূজার দিন সকাল থেকে গাঁজার আসর বসে। দশটা, সাড়ে দশটা নাগাদ পূজা শেষ হয়। তারপর বলিদান এবং ভাঁড়াল আনা। অপরাহ্নে মদ্যমাংস সহযোগে ভূরিভোজন হয়। বিকালে ভক্ত্যারা মাথায় বারি নিয়ে নাচতে থাকে। একে বলে মাঠ নাচানো। তৃতীয় দিনে বানগোঁসাই-এর উপর শুয়ে একজন ভক্ত্যা অপর চার পাঁচজন

মাঠ নাচানো

কর্তৃক বাহিত হয়ে পুকুর ঘাটে আসে। আরোহীকে জলে নামিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর সকলে ফিরে এলে পুনরায় পূজা আরম্ভ হয়। পূর্বদিনের অনুষ্ঠানগুলিরই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় শলাকাযুক্ত বানগোঁসাই-এর উপর দুজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং বাহকেরা ধর্মঠাকুরের ঘট নিয়ে বিসর্জন দিতে চলে। **পুকুরের জলে আরোহীরা আধঘণ্টা ডুবে থাকে।** তারপর উপরে উঠে আসে এবং অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বাড়ী ফেরে।

আখপেষণের শালে ঘোড়া

আখের শালে আখপেষণের সময় ধর্মের ঘোড়া নিয়ে পূজা হয়। যত দিন আখপেষণ চলে তত দিন ঐ ঘোড়াটিকে শালে রাখা হয়।

প্রবাদ

ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠার একটি প্রবাদ আছে—বর্ষণমুখর এক পরিশ্রান্ত দিবাবসানে জনৈক শ্রান্ত কৃষক নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখে, চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হচ্ছে। তারপর সে দেখে একজন জটাজুটধারী সৌম্যকান্তি সাধক গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তার শিয়রে এসে জলদগম্ভীর স্বরে বলছেন, "শুনতে পাচ্ছিস। আমি তোদের গ্রামের উত্তর সীমান্তে অপরিস্কৃত পুকুরে ঈশান কোণে আছি। তুই আমাকে তুলে নিয়ে এসে সেবা কর। আমি তোর হাতে পূজা পেতে চাই।" এই বলেই তিনি অদৃশ্য হলেন। কৃষক পরের দিন এই কথা সকলকে জানিয়ে ধর্মঠাকুরকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করে।

অন্যান্য

ধর্মের কাছাকাছি ষষ্ঠী আছেন। কিছুদূরে বেলতলায় আছেন এক ব্রহ্মচারী। প্রবাদ, অনেকে রাত্রে তাঁকে দেখতে পান। এঁর নিকট পূজা ও মানসিক দিলে মৃগীরোগ আরোগ্য লাভ করে বলে লোকবিশ্বাস। গ্রামে তাছাড়া আছে ব্রাহ্মণদের পূজিত মনসা (ভাদ্রে পূজা)। মণ্ডলদের শিব (ফাল্গুন), ডোমদের ক্ষেত্রপাল (১লা মাঘ), সাধারণের গ্রামদৈত্য (১লা মাঘ)। এখানে শূকর বলি হয়।

অতিরিক্ত বাঙলা প্রবাদ

কল্যাণী দত্ত

ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের "বাঙলা প্রবাদ" গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণে (প্র° ১৩৫৯ সাল) নয় হাজারেরও অধিক প্রবাদ এবং ঐ জাতীয় শব্দ সমবায় লইয়া হাজার পৃষ্ঠার একটি অপরিহার্য্য রেফারেন্স বই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ গ্রন্থের মর্য্যাদা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকিয়া, উহার একটি পরিশিষ্ট বা সম্পূরক অংশ সঙ্কলিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহাতে রহিয়াছে—

(ক) নূতন প্রবাদ, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং শব্দ।

(খ) ঐ জাতীয় মেয়েলি এবং ছেলে ভুলানো ছড়া।

(গ) সেকালের বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গির নমুনা।

(ঘ) পাঠান্তর, গুরুতর অর্থভেদ ও কচিৎ সংশোধনাদি।

(ঙ) প্রচলিত প্রবাদের মূলের অনুসন্ধান ও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা।

আমাদের আদর্শ গ্রন্থে কোনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ নাই বলিয়া বর্ত্তমান সংগ্রহে কেবল ঐ কারণে গুরুতর জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও সবগুলি শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ও ছড়াকেই প্রবাদ নাম দিয়া একত্র রাখা হইয়াছে। ইহা পড়িবার সময় সর্ব্বদাই ডঃ দের গ্রন্থখানির সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে, নহিলে ইহা অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন বোধ হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় সংস্করণে ডঃ দে প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠায় যে সুবৃহৎ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহার পর প্রবাদ সম্পর্কে নূতন আলোচনার আর প্রয়োজন অনুভব করি নাই।

অং বং চং ॥১॥

=সংস্কৃত ভাষার প্রতি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত

অতি দোসর হয় গালে তুলে দেয়

টিকুলেত নয় ॥২॥ [দে—৩৭]

পাঠান্তর :

অতি বড় ব্যথী হয়

হাতে তুলে মুখে দেয়।

গিলুলেত কাজ করে॥

অন্তর টিপুনি ॥৩॥

"এমনি দেন অন্তর টিপুনি।

গরুড় কাঁপে মরণ কাঁপুনি॥" দাশুরায়

অবরে সবরে / অপরে সপরে ॥৪॥

=কদাচিৎ কচিৎ

অবু তবু গিরিসুতো।

মায়ে বলে পড় পুতো ॥৫॥

হাতে খড়ির ছড়া। ইহার মূল শ্লোক—

অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা। ইত্যাদি

গঙ্গাদাস কৃত ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে গজগতি ছন্দের উদাহরণ।

অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভ ॥৬॥

অল্ বোড্ডে ॥৭॥

=অগোছাল

"কোপাই নদীর আল্ বোড্ডেমি তাদের আছে, তারা একটু সাজতে গুজতে ভালবাসে।" হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—তারাশঙ্কর। অল্ বোড্ডে শব্দের এইরূপ ব্যবহার আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ইহা সম্ভবত আঞ্চলিক।

অসভ্যের নাজীর ॥৮॥

অসময়ে সকলি সই।

শোনরে দুঃখ তোমারে কই ॥৯॥

আউলা চুলে রান্ধে।

সাত পুরুষে কান্দে ॥১০॥

আক কাটতে ছুরি দিয়েচি নাকটি কেটেচে ॥১১॥

মেয়েলি ছড়ায় বোকা জামাইয়ের বর্ণনা। ইহা হইতে অর্থ=মূর্খ [দে—১৯৯]

আকৃখুটের দশা / মরণ ॥ ১২ ॥

আকন্দের ডাল মুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকা ॥১৩॥

=অতি দীর্ঘকাল বাঁচা

আকাশ প্রমাণ বাবাজী তার ছালাভরা কাঁথা।

এ বাবাজী মলে পরে সমাধ দেবে কোথা ॥১৪॥

তুলনীয় :

"কন্থাং বহসি বৈরাগিন্ বাহিকেনাপি দুর্বহাম্"

আকের টিকলি ॥১৫॥

"মল্লিকে তোমার কথাগুলি ভাই আকের টিকলি"—দীনবন্ধু মিত্র

আগ্ দরশন দুখানি চরণ

পাছ দরশন ঝুঁটি।

মুখ দরশন হাস্তবদন

বুকে মাজায় খুঁটি ॥১৬॥

মেয়ে দেখিতে গিয়া কি ভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে তাহার নির্দেশ। আগে পা দেখিয়া লক্ষণ বিচার, তাহার পর ঝুঁটি নাড়িয়া চুল যাচাই, তাহার পর হাসাইয়া দাঁত দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আগে পা পরে গা।
মাথায় দিয়ে নাইতে যা ॥১৭॥

=তেল মাখিবার নিয়ম

আজল কুমারী ॥১৮॥

আজলি আজুলি কয় ছেলে।
ভাতার নিয়ে নয় ছেলে ॥১৯॥

আঁটকুড়োর বেটা ॥২০॥

"আঁটকুড়োর বেটাবেটীদের গুষ্টির পিণ্ডি হচ্চে"—বিবেকানন্দ-পত্রাবলী

আড়ষ্ট বদ্যিনাথ ॥২১॥

আতা বলতে উল্লা বলে ফেলা ॥২২॥

=খুব চট্পটে চালাক

আতুসী ॥২৩॥

=অল্পে কাতর

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া ॥২৪॥

আথান্তরে[১] পড়া ॥২৫॥

১ অবস্থান্তর=বিপদ

আদরের গঙ্গামণ্ডল[১] ॥২৬॥

১ শোভাবাজার রাজবাড়ীর বৃহৎ তালুক

"তুমি আমার আদরের গঙ্গামণ্ডল গো"—বিয়ে পাগলা বুড়ো—দীনবন্ধু

আদায় কাঁচকলায় ॥২৭॥

"একসঙ্গে সিদ্ধ হয় না বলিয়া শত্রুতার অর্থ" [দে—৩৮৫] মূলগ্রন্থের এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে। আদায় কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এবং কাঁচকলায় কাঠিন্য জন্মায়। উভয়ের এই বিপরীত গুণ হইতেই শত্রুতার অর্থ আসিয়াছে।

আদার ক্ষেতে কুঙ্কুম ॥ ২৮ ॥

আভিরস করা / আভিরসের বদ্যি ॥ ২৯ ॥

=আচার বিচার বা প্রথাপালনের আতিশয্য। মূলত ইহা সেকালের প্রথাবিশেষ। কন্যাকর্তা কুলীনের কন্যার কুলরক্ষার জন্য প্রথমে তাহার বিবাহ দিয়া পুনরায় সেই পাত্রে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতেন। ইহার বিবরণ জামাইবারিকে দ্রষ্টব্য।

আন্তিরসের দোজবরে।
চিরটা কাল জ্বালিয়ে মারে ॥
আধকপালে মাথা ধরা ॥ ৩০ ॥
আন তো চেড়ী—অলঙ্কারের পেড়ী[১]।
কানের তালপাতা মাথাবাঁধা দড়ি ॥ ৩১ ॥
১ পেড়া বা প্যাঁটরা।
আনচিত্ত রাধার মুন।
শাকে বালি দুধে নুন ॥ ৩২ ॥
আন্দাজে ঘোড়া টেপা ॥ ৩৩ ॥
আন সখীরে পার করিতে লব আনা আনা ॥ ৩৪ ॥
=নৌকাখণ্ডের গান, অর্থ—সামান্য লোকের জন্য সামান্য ব্যয়।
আপটির মা কাপটি ॥ ৩৫ ॥
=খুব আঁটসাঁট বা কৃপণ।
আপন কোটে কুকুরও বড় ॥ ৩৬ ॥ [দে—৪২৩]
মূল প্রবাদ—"স্বকে গেহে কুকুরোঽপি তাবৎ চণ্ডো ভবতি"—মৃচ্ছকটিক
এই ধরনের অন্য প্রবাদগুলির জন্য ডঃ দের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
আপনার ঘর আঁধারে আলো।
পড়ে মরি সেও ভালো ॥ ৩৭ ॥
আপনার বেলা কাঁটালে আর ক্ষীরে-
ঠাকরুণ খায় পুঁই-ডাঁটা আলুনি
তায় ভাঙা পাতরে বেড়ে ॥ ৩৮ ॥
আপনি আর কোপনি ॥ ৩৯ ॥
আপনার দেখলে পরের হয়
পরের দেখলে ঝোড়ের হয় ॥ ৪০ ॥
কুস্বপ্ন দেখিলে আবৃত্তি করিবার রীতি ছিল।
আপনি নাচে আপনি গায়।
একটি লোকের সম্প্রদায় ॥ ৪১ ॥
আফিমিয়া ভালা গাঁজাই চোর ॥ ৪২ ॥ [দে—৫১৮]
মূল অর্থ অস্পষ্ট। অনুরূপ ওড়িয়া প্রবাদের পাঠ এইরূপ :—
আফিমিয়া চোর গঞ্জিকা ভোল।
ধুমা পত্রিকা ঘরে নিত্য গোল ॥
অর্থাৎ আফিংখোর চুরি করে, গাঁজাখোর ভুলো স্বভাবের হয়, তামাকখোর হল্লা করে।

আবুদেরে কানাই।

আবাহনও নেই বিসর্জ্জনও নেই।

আবোল তাবোল ॥ ৪৩ ॥

আম ফলে থোলো থোলো তেঁতুল ফলে বাঁকা। [দে—৫৪২]

পূর্ব্ববঙ্গীয় পাঠে ইহার পরবর্ত্তী চরণ অনুরূপ—

ছাওয়াল সুদ্ধাই বিয়া করে মায়ের ঝোলায় টাকা ॥ ৪৪ ॥

আমড়া কাঠের ঢেঁকি। ॥৪৫॥ [দে—৫৩২]

প্রচলিত পাঠ গাব কাঠের—

"তোর মত গাবের ঢেঁকি আর দেখি নি"—পথের পাঁচালী

আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব

ঘুঁষি খেলে বাঁচব না ॥ ৪৬ ॥—ঈশ্বর গুপ্ত

আমার কি হোল গো খোদা

আমি মিছে করে স্থাকড়া বেঁধে

পা করেছি গোদা ॥ ৪৭ ॥

আমার বিয়ে যেমন তেমন।

দাদার বিয়ে রায় বেঁশে ॥ ৪৮ ॥

আমি কি কারও মাসোহারা খাই / আমি কি কারও খাই না পরি ॥ ৪৯ ॥

আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ॥ ৫০ ॥—মেঘনাদ বধ কাব্য।

আরশি আরশি আরশি

আমার বর পড়ুক ফারসী ॥ ৫১ ॥

আরশি নগরের পড়শি ॥ ৫২ ॥

—অর্থ, মনের মানুষ। লালন ফকিরের গান দ্রষ্টব্য।

আলুনিপনা ॥ ৫৩ ॥

আহ্লাদে লো ঢেপের খই ॥ ৫৪ ॥ [দে—৭০১]

পাঠ—আলুনি আদর ঢেপের খই।

হেন আদর কারে কই ॥

ইট পায় নাট্‌ফুট কাটে ॥ ৫৫ ॥

রূপচাঁদ পক্ষীর গাঁজার আড্ডার বিবরণে দেখা যায় যে ওস্তাদ যত বড়, তাহাকে বসিতে ততগুলি ইট দেওয়া হইত। যাহার একটানে কলিকার মাথায় আগুন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, সেই ইট পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিত।

উস্‌তুন ফুস্‌তুন করা ॥ ৫৬ ॥

—ওলোট পালোট করা / ব্যতিব্যস্ত করা।

উপুড়ঝান্ত / অজঝোর ঝোরে বৃষ্টি পড়া ॥ ৫৭ ॥

=অবিশ্রান্ত।

এক যে ছিল কুকুর চাটা শেয়ালকাঁটার বন।
কেটে করলে সিংহাসন ॥ ৫৮ ॥

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসে উদ্ধৃত।

এক যে ছিল গেরস্তের বউ কবাটের আড়ে।
নাচতে নাচতে পড়ল গিয়ে ভাশুরের ঘাড়ে ॥ ৫৯ ॥

এক পয়সা মাবাপ ॥ ৬০ ॥

ইহারই আধুনিক রূপান্তর—ওয়ান পাইস ফাদার মাদার।

একপো দুধ কিনেচি কি হবে তা বলো না ॥ ৬১ ॥

ইহার সম্পূর্ণ পাঠের জন্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া' দ্রষ্টব্য।

একলা ঘরের গিন্নি হব ॥৬২॥ [দে—১০৪৮]

পাঠান্তর—একলা ঘরের গিন্নি হব
গিন্নি হয়ে সিন্নি দোব
কাঁধে গামছা ফেলে নাইতে যাব।

এক সূর্য্যে রোদ পোয়ানো ॥ ৬৩ ॥

এক বনে দুই বাঘ ॥৬৪॥ [দে—৯৯৫]

সম্পূর্ণ পাঠ—এক বনে দুই বাঘের ঠাঁই হয় না। ইহা প্রচলিত হিন্দী বচনের অনুবাদ—

"তুম্ ভি অব্ শের হো গিয়া, বাকি দো শের এক ঠোরসে নহি রহনে সকতা হ্যায়"—রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে ॥ ৬৫ ॥—বীরাঙ্গনা কাব্য

এখন বাদশাজাদীর মতন চাল।
শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল ॥ ৬৬ ॥

এখন তোমার পড়েচে পাশা
গড়িয়ে নিও ঝুমকো খাসা ॥ ৬৭ ॥

এতকাল নয় ততকাল
দাসীর পাতে কেন ক্ষীরের তাল।
দুধ বা নট—
বেড়ালের বা এঁটো ॥ ৬৮ ॥

এ না টিপ কে না পরে।
কপালের গুণে টিপ ঝলমল করে ॥ ৬৯ ॥

এমন গাঁয়ে বাস করি।
একঘর স্তাকরা নেই যে
এক জোড় মল পরি॥ ৭০ ॥
এমন বর্ত্ত করালে সই
কেঁদে সুখ হোল কই॥ ৭১ ॥
এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥ ৭২ ॥—ভারতচন্দ্র
এল ভাউরী মল বাউরী॥ ৭৩ ॥
এসেচেন এক বড়মানুষের বেটী
দানে এনেচেন ফুটো ঘটী
তায় জোটে নি এঁটেল মাটী॥ ৭৪ ॥

ওখানে কে গা? আমি সর্ব্বময়ী
দাঁড়িয়ে কেন গো? না দুটি খুদের জন্যে॥ ৭৫ ॥
ওদের বাড়ীর কথা বোল না বাপা
এবেলা খেলে ফের ওবেলা হ্যাঁপা।
আমার বাড়ী দিব্যি তোফা
আজ খাবি কাল খাবি॥ ৭৬ ॥
ওলো দাসী সর্ব্বনাশী বুক জলে দেখ আসি॥
যত পাড়া প্রতিবাসী হাসি হাসি মুখ লো॥ ৭৭ ॥
ওহে ও বনমালী।
তোমার সারকুড়েতে রেওত ফেলে
তলাতে বেরুল বালি॥ ৭৮ ॥

কট্‌কেন / কট্‌কেনা[১]॥ ৭৯ ॥

১ অতিরিক্ত আচার বিচার
"তব পদ দুটি মাড়াবে যে মাটি
শ্রীমতী ত সেটি ছোঁবে না
তুলিয়ে সে মাটি দিবে ছড়া ঝাঁটি
রাধিকের এত কট্‌কেনা॥"—রাসু কবিওয়ালা

কড়ে[১] রাঁড়ী॥ ৮০ ॥

১ ছোট, তুলনীয় কড়ে আঙল।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী হলে কথা কয়।

কথা কইতে জানলে হয়।
কথা যোল ধারে বয়॥ ৮১ ॥

কদমতলায় বেজায় ন্যাটা।
কাপড় টানে স্যাকুল কাঁটা ॥ ৮২ ॥
কপালের কর্ম্মদোষে।
বাঁদরে নারকোল চোষে ॥ ৮৩ ॥
কবে আমি রাজা হব।
রাজতক্তে বসে ধামায় করে মুড়ি খাব ॥ ৮৪ ॥
কাক জ্যোৎস্না ॥ ৮৫ ॥ [দে—১৪৮৪]

মূলের "ম্লান জ্যোৎস্না" অর্থটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ভোর হইয়াছে ভাবিয়া কাক কখনও কখনও ডাকিয়া ওঠে। লাক্ষণিক অর্থ : ক্ষণকালের বিভ্রম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি উপন্যাসের নাম 'কাক জ্যোৎস্না'।

কাগ কেটে আমাবস্তে উদ্‌যাপন ॥ ৮৬ ॥
"তাই সই, কাগ কেটে আমাবস্তেই হোক।"—'কবি', তারাশঙ্কর

কাগ রা'য় গেল বউ শেয়াল রা'য় এল
জেতের বউ তাই সব সামলে গেল ॥ ৮৭ ॥

কাগ রা'=কাক ডাকা ভোর।
শেয়াল রা'=শেয়াল ডাকা সন্ধ্যা।

কাগের করুন্দে[১] হবে।
ধুলোয় লুটিয়ে যাবে ॥ ৮৮ ॥

১ রোগ বিশেষ

কাগের ঠ্যাঙ্ বগের ঠ্যাঙ্ (লেখা) ॥ ৮৯ ॥ [দে—১৫০১]
কাগের বাসা ॥ ৯০ ॥

=মাথার চুলের বর্ণনা।

কাঁচি করে মুগের ডাল কাটা ॥ ৯১ ॥
কাজল বলে আজল ভাই
আমি গোর মুখে চাঁদ।
কালা মুখে গেলে আমি
জলে দিব ঝাঁপ ॥ ৯২ ॥
কাজের তোড়া কেমন।
না, পেটের ছেলে ভুঁয়ে প'ড়ে যাবে এমন ॥ ৯৩ ॥
কাঠের ঘোড়া হোক জল খেলেই হোল ॥৯৪॥ [দে—১৬২৩]

অশোক ষষ্ঠীর ব্রতকথার উক্তি—

'কাঠের ঘোড়া কাঠের ঘুড়ী জল পী পী।'

(কাঁথায়) কঁ্যাতায় আগুন ॥৯৫॥

কাদায় গুণ ফেলে বাস করা ॥৯৬॥

কান কেটে কুত্তার পায়ে দেওয়া ॥৯৭॥

কান চায় সোনা সোনা চায় কান [দে—১৬৪১]

পরবর্ত্তী অতিরিক্ত চরণ—

কানের জন্যেতে সোনা গড়াগড়ি যান ॥৯৮॥

কান থাকতে কালা চোখ থাকতে অন্ধ।

ঘুরে ঘুরে ভেবেই সারা পদ্মের নাকি গন্ধ ॥৯৯॥

'বনপলাশীর পদাবলী'—রমাপদ চৌধুরী

কানের কাছে কানাইয়ের বাসা ॥১০০॥

কাল হাঁড়ি কেয়াপাত।

তবে দেখ জগন্নাথ ॥ ১০১ ॥ [দে—১৮১৫]

"কালো হাঁড়িতে রাঁধা ও কেয়াবন দিয়া যাওয়া শ্রীক্ষেত্রে দর্শনের কষ্ট" ডঃ দে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা বোধ হয় ঠিক নহে। সেকালের দিনে এঁটোর বিচার অত্যন্ত বেশী থাকায় কালো অর্থে কালিমাখা এঁটো বা আমাজা হাঁড়িতে রাঁধিয়া তীর্থযাত্রীরা খাইতেন না। এটি পায়ে-হাঁটা যাত্রীদের পথনির্দ্দেশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। পথ চলিতে চলিতে যাত্রীর দল যখন চটিতে ও দোকানে বাঙলাদেশের লালরঙের মেটে হাঁড়ির পরিবর্ত্তে পুরীজেলার কালো রঙের মাটির হাঁড়ি এবং দুইধারে কাজেকর্ম্মে কেয়াপাতার কুলো ডালা ঝাঁপ ইত্যাদি দেখিতে থাকিবে, তখন বুঝিবে শ্রীক্ষেত্র আসিয়াছে।

কালে কালে এত কাল।

ছাতু ভিজে এত ঝাল ॥১০২॥

কাঁটা ঝুলে যাওয়া। ১০৩॥

কিল চাপড় মায়ের কাপড়

সেও কি আমায় মারে

সোহাগী নাচন করে ॥১০৪॥ [দে—২৮৭৫]

কীটস্য কীট ॥ ১০৫ ॥—নীলদর্পণ

কীর্ত্তনের পর বাতাসা ॥১০৬॥ 'প্রথম কদম ফুল'—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

কী শোভা হয়েচে মোর বারান্দায় বসে।

ঘুরিয়ে বেঁধেচি খোঁপা গোলাপ দুই পাশে ॥১০৭॥

কুকাটনী খড়ি খাবার যম ॥১০৮॥ [দে—১৮৮৫]

"খড়ি একজাতীয় ইক্ষু" মূলের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। খড়ি খাওয়ার অর্থ আখ খাওয়া নহে। খড়ি শরজাতীয় গাছ, উহা জলাজমিতে

জন্মায়। হাতে খড়ি ঘষিয়া চরকাকাটুনী চরকা কাটে। যে কাটিতে জানে না, সে হাতে ঘষিয়া ঘষিয়া বিস্তর খড়ি লোকসান করে। তাই "খড়ি খাবার যম"। মেয়েলি ব্যবহারে এই ধরণের কথা বিস্তর, যেমন—কাদা চিংড়ী তেল খাবার যম, অর্থাৎ কাদা চিংড়ীর বড়া ভাজিতে তেল বেশী খরচ হয়।

কুকুরের সঙ্গে কি তুলসীর ঝগড়া? ॥ ১০৯ ॥—দাশু রায়ের গান দ্রষ্টব্য

কুঁজ্‌ড়ো কথা ॥১১০॥

"পেটটি ভরা কুঁজ্‌ড়ো কথা পরনিন্দা গ্লানি"—হেমচন্দ্র

কুটুমের টেক্কা ॥১১১॥

"তুমি হলে শালী, কুটুমের ঘরের টেক্কা"— ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুন্‌কীর কপালে পো হয় না ॥ ১১২ ॥

কুমীরের বাচ্চা দেখানো ॥ ১১৩ ॥ শেয়াল পণ্ডিতের গল্প দ্রষ্টব্য।

কোকিল পুড়িয়ে-খাওয়া ॥ ১১৪ ॥ [দে—২০৩০]

ইহার মূলের জন্য মৃচ্ছকটিক নাটকে শকারের প্রসিদ্ধ উক্তি—

"হিঙ্গুজ্জ্বলং দত্তমরীচচূর্ণং ব্যধারিতং তৈলঘৃতেন মিশ্রম্।

ভুক্তং ময়া পারভৃতীয় মাংসং কথং নস্যাং মধুর স্বর ইতি ॥

কোঁচড়ে কি কড়ি বেঁধে বেড়ায়? ॥ ১১৫ ॥

মূল বচন—মৃচ্ছকটিক নাটক দ্রষ্টব্য।

"যস্যাস্তি ধনং স কিং ক্রোড়ে কৃত্বা দর্শয়তি"।

কোট ধরে বসে থাকা ॥১১৬॥

কোলাকুলি কণ্ঠা ধরে।

শেষে বিদায় ঘণ্টা নেড়ে ॥১১৭॥

ক্যাবলা রাম / গণেশ ॥১১৮॥

ক্ষুদ খাউ খেয়ে ভরালুম পেট।

স্বর্ণ ফলুক দাদার ক্ষেত ॥১১৯॥

খড়ের কার্ত্তিক ॥১২০॥

কার্ত্তিকের খড় বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

খরচের খাতায় নাম লেখানো ॥১২১॥

খা খা খা—যদ্দিন না হয় ছা।

পো পো পো—যদ্দিন না হয় পো ॥১২২॥

খাই খাই খেয়ে মরি।

মহাপ্রাণী শীতল করি ॥১২৩॥

খাওয়া নয় গর্ত্ত বুঁজোনো ॥১২৪॥

খাব না খাব না অনিচ্ছে [দে—২ ১৬]

অন্যরূপ পাঠ—

না খাম না খাম তালের বড়া

না খাম না খাম গা।

আমার জন্যে তিন তের গণ্ডা

তুলে রেখে খা ॥১২৫॥

খাসনে কেন রে দাঁতে পোকা।

বিলোস নে কেন রে ওরে বাবা ॥১২৬॥

'খুকুমণির ছড়া'—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

খিরকিচ করা। খিরকিচের কাছারী। নিখিরকিচ ॥১২৭॥

খেয়ে যায় নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে।

হায় হায় ওই যায় বাঙালীর মেয়ে ॥ ১২৮ ॥—হেমচন্দ্র

খেঁদী কি বলতে দোব ?

সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দোব ॥১২৯॥

খোরা খোরা খোরা।

সতীনের মাকে ধরে যেন নেয় তিন মিন্‌সে গোরা ॥১৩০॥

গঙ্গায়ও মলুম ভূতও হলুম ॥ ১৩১ ॥

গঙ্গার আবার গঙ্গালাভ ॥ ১৩২ ॥

গডাচর চন্দ্র ॥ ১৩৩ ॥

তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা'র একটি প্রসিদ্ধ চরিত্র। বর্ত্তমানে শব্দটি ন্যাকা-বদমায়েস অর্থে চলে।

গণেশ আঁকড়ি ॥ ১৩৪ ॥—'বর্ণ পরিচয়'

গণেশের যাত্রাভঙ্গ ॥ ১৩৫ ॥

গতরে মাওড়া পোকা ধরা ॥ ১৩৬ ॥ [দে—২৩৪৪]

পাঠান্তর—শুঁয়োপোকা ধরা।

গরু হারালে ক্যাস্টর অয়েল ॥ ১৩৭ ॥

গাণ্ডে পিণ্ডে খাওয়া ॥ ১৩৮ ॥

গান্ধার শুনে চাঁপা কলার খোঁজ ॥ ১৩৯ ॥ অর্থ=জহুরীর নজর।

মূলের গল্পটি এই—সুপ্রসিদ্ধ গোপাল উড়ে প্রথম জীবনে কলিকাতার রাস্তায় কলা বেচিতেন। একদিন তাঁহার সেই 'চাই চাঁপাকলা' হাঁক শুনিয়া বিশুদ্ধ গান্ধার রাগ চিনিতে পারিয়া বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ

তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন। পরদিন হইতে রাধামোহন সরকারের যাত্রার দলে গোপালের চাকরী হয়।

গাড়ুর গুপ্সো (চেহারা) ॥ ১৪০ ॥

গিন্নী আছিলাম কালে।
জল বিলাইছি খাবলা খাবলা
তেল বিলাইছি নালে ॥ ১৪১ ॥

গোড়ে গোড় দিয়ে চলা ॥ ১৪২ ॥

গোড়ের মালা বিয়ে দিল
গাঁ ষোল আনা ভোজ পেল।
কুকুর খেল ছাগল খেল
গোড়ের মালা শুকিয়ে মল ॥ ১৪৩ ॥ 'বনপলাশীর পদাবলী'—রমাপদ চৌধুরী

গোবর দিয়ে মুখের ছাঁচ নেওয়া ॥ ১৪৪ ॥

গোলোক তুল্য ধাম
রাম তুল্য নাম ॥ ১৪৫ ॥

গোসা ঘরে যাওয়া ॥ ১৪৬ ॥

কেরানীর যত নারী পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাস্টারের মিস্‌টেস্‌রা গোসাঘরে যায় ॥—হেমচন্দ্র

ঘট-কচু-ডোম্‌ণী ॥ ১৪৭ ॥

=অর্থহীন শব্দসমষ্টি।

"পুথির লেখা পড়িতে না জানিলে ঘটক চূড়ামণি চিরদিনই ঘট-কচু-ডামণি হইয়া দাঁড়ায়"।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘটায় নমো করে সারা ॥ ১৪৮ ॥

ঘট ঘটায় নমো
পট পটায় নমো
যটা ঘট তটায় নমো।

ঘাড়ে গঙ্গাজল দেওয়া ॥ ১৪৯ ॥

বলির পূর্ব্বে পাঁঠার ঘাড়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া উৎসর্গ করার প্রথা হইতে প্রবাদটি আসিয়াছে।

ঘাসমুটি ঘাসমুঠি
সতীনের হোক কুড়িকুষ্ঠি ॥ ১৫০ ॥

সেঁজুতি ব্রতের ছড়া

ঘুরেও কুত্থুর বাপ।
ফিরেও কুত্থুর বাপ ॥ ১৫১ ॥

চল চল সহচরী।
রথের পথে শয়ন করি ॥ ১৫২ ॥
চারি চপ্পণ[1] পদ্মপাত
গড়াগড়ি দুধে ভাত
কুস্বপন সুস্বপন
কাল সয়া আসবে এখন ॥ ১৫৩ ॥

চারি চপ্পন শব্দের অর্থ অস্পষ্ট। ভিন্ন পাঠে—চার ভিতে দপ্পণ=দর্পণ পাওয়া যায়। অর্থ=ঐশ্বর্য্য বা পরিপূর্ণতা।

চিপ্টেন কাটা ॥ ১৫৪ ॥
চিঁড়ের বাইশ ফের ॥ ১৫৫ ॥

মূল গ্রন্থে "বাইশবার ফিরাইয়া ওজন বাড়ানো" এই ব্যাখ্যা হইতে কিছু বোঝা যায় না। এখানে চিঁড়ার সংখ্যা Geometrical progression-এ বাড়িতেছে তাহা না বুঝিয়া অনেকে বাইশ ফের চিঁড়া খাইবার বাজী ধরে ও হারিয়া যায়। বাইশ ফেরে পড়ার অর্থ, না বুঝিয়া বিপদে পড়া।

ছ বুড়ির ফলে অমিত্তি হারানো ॥ ১৫৬ ॥ [দে—৩১৬৭]

ডঃ দে 'ছ বুড়ি' শব্দের টুকরি অর্থ করিয়াছেন। এখানে ধারাপাতের বুড়িকিয়া স্মরণে রাখিয়া ছ বুড়ি অর্থে অতি সামান্য বুঝিতে হইবে। অমিত্তির অর্থ পিকদানী। মূলে অবশ্যই কোন পুরাতন গল্প ছিল।

ছ মাস ফাঁসি ॥ ১৫৭ ॥ 'নীলদর্পণ'—দীনবন্ধু
ছাঁচি পান এলাচি গুয়ো
আমি সোহাগী সতীন দুয়ো ॥ ১৫৮ ॥
ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া ॥ ১৫৯ ॥

"কি দোষে করেছ দুর্গে আমায় ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া"
—প্যারীমোহন কবিরত্ন

ছেলের পাট/ডাঁজ ॥ ১৬০ ॥

"বাড়ীতে ছেলের ডাঁজ নেই"—দীনবন্ধু

ছেলের মা গয়না গাঁথে।
ছেলেটি ভুড়ুক নাচে ॥ ১৬১ ॥
ছোঁক ছোঁক করা ॥ ১৬২ ॥

জজানো মজানো / জৈ জৈ করা ॥ ১৬৩ ॥

=সব একাকার করা / জৈ জৈ (হিন্দী) জয় জয় বুঝাইতেছে।

"কী আক্কেলে সব ছোঁয়া নেপা ক'রে জৈ জৈ করল।"

স্ত্রীপর্ব্ব—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জননী কি পুণ্যবান্।

রত্নগর্ভে এ সন্তান ॥ ১৬৪ ॥

জলসই ॥ ১৬৫ ॥

"দড়ি কলসী নিয়ে ব্যাটা হ'গে জলসই"—ভোলা ময়রা

"অবিদ্যার আশায় আশায় সকল বিদ্যা জলসই"—গোবিন্দ অধিকারী

জলের কাছে স্বপন কইও

ভাল মন্দ ডুবাইয়া থুইও ॥১৬৬॥

জলের দাঁত বেরুনো ॥১৬৭॥

=শীতকালে জল ঠাণ্ডা হওয়া।

জষ্টিমাসে আঁব কাঁটাল আষাঢ় মাসে ইলিশ

ভাদ্দর মাসে তালের তত্ত্ব পূজোয় কুটুম পালিশ।

অঘ্রাণ মাসে শাল দোশালা পোষে গুড়ের নাগরী

ফাল্গুন মাসে দোলের তত্ত্বে পিচকিরী আর পাগড়ী ॥১৬৮॥

কলিকাতার কুটুম বাড়ীর তত্ত্বের ছড়া। রসরাজ অমৃতলালের 'তালের তত্ত্ব' কবিতা এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শুভ-বিবাহ' এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

জাত হারিয়ে বোষ্টম [দে—৩৪১১]

পাঠান্তর—জাত ভাঁড়িয়ে কায়েত ॥১৬৯॥

জানি কিন্তু বলব না ॥১৭০॥

জানিনে পারিনে নেইকো ঘরে।

এ তিন ওজরে দেবতা হারে ॥১৭১॥

জাম্বাইন্যার পতি।

কমের লগে দেখা নাই

যুক্তির গুঁতাগুঁতি ॥১৭২॥

জাণ্ড ॥১৭৩॥

"তুই ব্যাটা সি দেদের জাণ্ড—আমি মালীর মেয়ে।"—গোপাল উড়ে ; অনুরূপ আধুনিক ব্যবহার—চোরের জাণ্ড, বজ্জাতের জাণ্ড ইত্যাদি।

জীয়ন্তে না দিলে ভুড়ি

মলে দেবে বেনাগাছ মুড়ি ॥১৭৪॥ [দে—৩৪৬২]

শুদ্ধ পাঠ এইরূপ :

জীয়ন্তে না দিলে তুঁড়ে
মলে দেবে বেনা ঝোড়ে ॥

অর্থ=জীবিত কালে সেবা না করিয়া মৃত্যুর পর আড়ম্বর করা।
তুঁড়ে=তুণ্ডে=মুখে।

সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সমাজে মৃত্যুর পরদিন হইতে শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত বেনাগাছের মুলে ক্ষীরের নাড়ু ও গঙ্গাজল দিবার রীতি এখনও আছে।

জোনাকির পোঁদে আলো
বর একটি গান বল।
তা যদি না করতে পার
ভগ্নী এনে হাজির কর।
তা যদি না করতে পার
আমার ভগ্নীর পায়ে ধর ॥ ১৭৫ ॥ বাসর ঘরের ছড়া।

ঝাল ভাত খাওয়া ॥
ঝাল ভাতের কান্না ॥ ১৭৬ ॥

পুরুষ বিড়াল অনেক সময় বাচ্চাকে খাইয়া ফেলে। কোন কোন অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাকে ঝাল ভাত খাওয়া বলে এবং বাচ্চাকে না দেখিয়া যখন মা কাঁদে তাহাকে ঝাল ভাতের কান্না বলে। পাত্রপক্ষের নিকট হইতে প্রচুর টাকা লইয়া বাপ কন্যাকে অপাত্রে দান করিলে "অমুকের বাপ ঝাল ভাত খেয়েচে" এবং "তার মা ঝাল ভাত খেয়ে কাঁদতে লেগেচে" সেকালে এইরূপ উক্তি চলিত ছিল।

ঝুরে লুসে কুপোকাৎ ॥ ১৭৭ ॥

খাওয়া দাওয়ার পর ঘুম দেওয়া। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
'আমাদের ভাষা'—প্রবাসী, ১৩৬০, দ্রষ্টব্য।

টাঙন ঘোড়ার বাচ্চা ॥ ১৭৮ ॥

পাঃ—জোয়ান গাইয়ের বাচ্চা। অর্থ=শক্ত মেয়ে।

টাটে[১] বসান ॥ ১৭৯ ॥

১ পূজার পাত্রবিশেষ

"ঐ চোপাবাজ বউকে টাটে বসিয়ে ফুলচন্নন দিয়ে কি পূজো করবে নাকি?"
'প্রথম প্রতিশ্রুতি'—আশাপূর্ণা দেবী

টিকেয় আগুন দেওয়া ॥ ১৮০ ॥

কালো মেয়ের লাল কাপড় পরার বর্ণনা—

টুইয়ে দেওয়া ॥ ১৮১ ॥

টোকলা সাধা ॥ ১৮২ ॥

"বাপ মরুক আর মা টোকলা সাধুক, নিজে একটা অনারেবূল না হলেই নয়।" 'বৌমা'—অমৃতলাল বসু

টোল খুলব পণ্ডিত আন।
গাঁ উজাড় মুসলমান ॥ ১৮৩ ॥

ট্যাক গড়ের মাঠ ॥ ১৮৪ ॥

ট্যাং ট্যাং ট্যাং
তার ভেঙে দিয়েছি ঠ্যাং ॥ ১৮৫ ॥

বঙ্গবাসী পত্রিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বিখ্যাত ছড়া।

ঠাণ্ডি পোলাও ঔর বাইগন কি কাবাব ॥ ১৮৬ ॥

—গরীবের খাদ্য লইয়া বিদ্রূপ।

ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের দায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায় ॥ ১৮৭ ॥

গোপাল ভাঁড়ের 'কায়েতি প্যাঁচের গল্প' দ্রষ্টব্য।

ডাক সাইটে ॥ ১৮৮ ॥

ডাকাবুকো ॥ ১৮৯ ॥

"ডাকাবুকা যায় একা যেমন বাঘিনী।"—শঙ্কর কবিচন্দ্র

ডাঙাভুঁইয়ে গাববৃক্ষ ॥ ১৯০ ॥

উড়িয়া প্রবাদ

ডামাডোল ॥ ১৯১ ॥

ডুবুরি নাবান ভাব ॥ ১৯২ ॥

গভীরতা লইয়া বিদ্রূপ।

ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনেকো ওমা কোথায় যাব।
কোনদিন বা বলবে মাণিক ঝিনুকে দুধ খাব ॥ ১৯৩ ॥

ঢলা ঢলা লাউপাতা
তোমার ভেয়ের গোনাগাঁথা ॥১৯৪ ॥ [দে—৩৬৮৫]

ইহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি চরণ পাইয়াছি, যাহা লইয়া ননদ ভাজের ম কথাকথির ছবিটি সম্পূর্ণ হয়—

রাঙা মাটি দিয়ে ঘর নিকিয়েচি
শোন সে ঘরে উঠো না।
তেল কাজল দিয়ে ছেলে শুইয়েচি
দেখ সে ছেলে ছুঁয়োনা।

দাওয়ায় না উঠিয়া ছেলে না ছুঁইয়া ছোট ননদ যখন লাউমাচার দিকে চাহিয়াছে তখন ভাজ বলিলেন—ঢলা ঢলা লাউপাতা ইত্যাদি।

ঢাকা দিয়ে শেয়াল যায়
পেঁড়োয় কুকুর ডাকে।
শান্তিপুরে বুড়ী বলে
কামড়ালে মোর নাকে॥ ১৯৫॥

তড়ি ঘড়ি॥ ১৯৬॥

তবুত সাবান মাখিনি॥ ১৯৭॥

কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু"
রাধা বলে "হাঁ, আজ সাবান মাখিনি ত তবু
নইলে আরও শাদা॥"—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তাড়াব না উঠোন চষব॥ ১৯৮॥

"একি সেই তাড়াব না উঠোন চষা কেন?" 'বৌমা'—অমৃতলাল বসু

তাঁতীকে মাকু চেনান॥ ১৯৯॥

তাল গাছের আড়াই হাত॥ ২০০॥ [দে—৩৭৬৭]

সম্পূর্ণ পাঠ—"শেষ আড়াই হাত"। ডঃ দে বলিতেছেন "তালগাছকে এক হাত প্রমাণ করিয়া মাপা", এই অর্থ-ঠিক নয়। শেষ আড়াই হাত শব্দের অর্থ—শেষের যন্ত্রণা। গাছে যে উঠে, শেষকালে কাঁটাওয়ালা পাতার দরুণ তাহার খুব কষ্ট হয়।

তিন দিনে প্রেম যায়।
চিরদিনে বিচ্ছেদ যায় না॥ ২০১॥

তিনদিনের জ্বরে।
পোঁদ দেখলে পরে॥ ২০২॥ [দে: ৯৬৯ তুলনীয়]

তিল সোনা / তিল সন খাটা॥ ২০৩॥

=ঋণ শোধ

ষষ্ঠীর ব্রতকথায় মা লক্ষ্মীর তিল ফুলের ঋণশোধ স্মরণীয়।

তিসৃরা বিবির পিছলা পা॥ ২০৪॥

তুমি আমার পেটে হয়েচ।

না আমি তোমার পেটে হয়েচি ॥ ২০৫ ॥

অর্থাৎ, তুমি চালাক না আমি চালাক।

তুমি কি চতুর শ্যাম আমার অপিক্ষে ॥ ২০৬ ॥

তুমি কেমন বড়মানুষের ঝি

তা কাঁচকলাটা কুটতে দেখে

খোসায় বুঝেচি ॥ ২০৭ ॥

তুমি যে পণ্ডিতে ভার্য্যে।

আমি চিনি সে ভট্টচার্য্যে ॥ ২০৮ ॥

তুলকালাম কাণ্ড ॥ ২০৯ ॥

তৃষার্ত্ত হয়ে চাহিলাম একঘটি জল।

তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল ॥ ২১০ ॥

তেল তিজেলে এক হোল।

মধ্যে বড়া চুঁয়ে গেল ॥ ২১১ ॥

তেলের বাটি গামছা হাতে গিয়েছিলুম নাইতে।

পা পিছলে পড়ে গেলুম বঁধুর পানে চাইতে ॥ ২১২ ॥

তোমার বোন আসবে

মেজে জুড়ে বসবে,

কেবা তারে তুষবে ॥ ২১৩ ॥

এইটি প্রবাদের মত বহুবিবাহ উৎসবে শুনিয়াছি। ইহার একটি সম্পূর্ণ পাঠ—

রাম কেষ্টর বে

আনা নেওয়া করবে কে?

আমার ভাই তোমার শালা

আনা নেওয়া করবে সে।

আমার ভাই যে রামের মামা

সে নইলে কে ধরবে সুচির ধামা।

আমার বোন যে রামের মাসী

সে নইলে কে করবে হাসি খুশি।

রাম কেষ্টর বে

গিন্নী হবে কে?

আমার মা তোমার শাশুড়ী

গিন্নী হবে সে।

আমার একটি বোন আছে
তাকে আনলে হয় না ?
তোমার বোন আসবে
মেজে জুড়ে বসবে
কথায় কথায় রুষবে।
কুটুম সাক্ষাৎ দুষবে
কেবা কারে তুষবে।
সাধতে মাধতে পারব না
তেমন যদি গতিক বুঝি
রামের বিয়ে দোব না ॥
ত্রিপুষ্করার পতি[১] ছাতুড়ে ॥ ২১৪ ॥

[১]ত্রিপুষ্কর দোষের ত্রাণকর্তা। মৃত্যুকালে পুষ্কর তিথি, পুষ্কর নক্ষত্র এবং পুষ্কর বার—এই তিনের যোগে যে দোষ ঘটে তাহাতে বংশ বাস্তু ও বৃক্ষাদি নষ্ট হয়।

তৈল, এক পয়সার তৈল কিসে খরচ হৈল।
তোর দাড়ি মোর পায় আরো দিছি ছেলের গায়
ছেলেমেয়ের বিয়ে গেছে সারারাত গান হয়েছে
কোন আবাগী ঘরে এলো বাকি তেলটা ঢেলে নিলো ॥ ২১৫ ॥
ত্যাঁদড় ॥ ২১৬ ॥

দহরম মহরম ॥ ২১৭ ॥
দাঁতে নুন আঁতে চুণ ॥ ২১৮ ॥
দিনের বেলা কথাকও চারদিক বাগে চেয়ে।
রাতের বেলা কথা কও চারদিক বাগে চেয়ে।
রাতের বেলা কথা কও আপন মাথা খেয়ে ॥ ২১৯ ॥
দিষ্টি খিদে ॥ ২২০ ॥
দিলে থুলেই রাঙাদিদি।
না দিলেই ঢ্যাঙাদিদি ॥ ২২১ ॥
দুধে আঁচায় ঘোলে ছোঁচায় ॥ ২২২ ॥
দুধের সর পানের শির হজম হয় না ॥ ২২৩ ॥
দেখন হাসি ॥ ২২৪ ॥

'তোমার বড়াই হবে দেখন হাসি'—দাশু রায়
'দাঁতে মিশি দেখন হাসি চুলে চাঁপা ফুল'—দীনবন্ধু

দৌঁড়ে-ঝুসে খাওয়া / আদায় করা ॥ ২২৫ ॥

"বৌমার বাপের গলায় রস্থুড়ি দিয়ে তখন দিব্যি দৌঁড়েঝুসে নিয়েছিলেন।"

'বৌমা'—অমৃতলাল বসু

দেবে দেবে আমরক্ত হাগিয়ে দেবে ॥ ২২৬ ॥

দোয়াত আছে কালি নাই ॥ ২২৭ ॥

—'হাসিখুশি' প্রথম ভাগ

দোষ উঁকিঝুঁকি ॥ ২২৮ ॥

=কল্পিত দোষ। রান্নায় খুঁৎ নাই, কিন্তু মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারিয়া খাওয়া দেখিয়াছে।

দোলা থেকে নেমেই গিন্নত্ব / গিন্নিপনা ॥ ২২৯ ॥

ধনীর বেটী ধনে মানায়।

নির্দ্ধনের বেটী গতরে মানায় ॥ ২৩০ ॥

ধনীতে ধনীতে মেলা

নির্দ্ধনের মর্ত্তমান কেলা ॥ ২৩১ ॥ [দে—৪৩০৪]

মূলে পাঠ ভুল থাকায় অর্থ নির্ণয় দুষ্কর। ইহার শুদ্ধ পাঠ যথা—

ধনীতে ধনীতে মেলা ঘন দুধে মর্ত্তমান কলা।

গরীবে গরীবে মেলা জোলো দুধে কাঁটালি কলা ॥

ধান এল আড়ি আড়ি বৌয়ের হোল জরজাড়ি—

ধান হোল মাড়া ঝাড়া বৌ দেয় পাশমোড়া

ধান তোলা হোল সাঙ্গ বৌ উঠে করে রঙ্গ ॥ ২৩২ ॥

ধানাই পানাই গাওয়া ॥ ২৩৩ ॥ [দে—৪৩৯০]

ইহার অর্থ সম্ভবত ঠিক নহে।

ধিনিকেষ্ট ॥ ২৩৪ ॥

ধুদ্ধুড়ি ধুয়ে দেওয়া / নেড়ে দেওয়া ॥ ২৩৫ ॥

ধুয়ে জল খাওয়া ॥ ২৩৬ ॥

মাদুলি বা কবচ ধুইয়া জল খাওয়ার প্রথা হইতে কথাটি আসিয়াছে।

"জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? আর নোটন দাস ভেগেচে"

কবি—তারাশঙ্কর

ধোপে টেঁকা ॥ ২৩৭ ॥

ধোবার বাসি নাপিতের আসি ॥ ২৩৮ ॥ [দে—৪৪৪১]

শুদ্ধ পাঠ—স্যাকরার আসি।

নাপিতের দীর্ঘসূত্রিতার কোন প্রবাদ কোন দেশেই নাই।

ধোলাই দেওয়া ॥ ২৩৯ ॥

নই নেও করা ॥ ২৪০ ॥ =একাকার করা

নখে তিনকাল ॥ ২৪১ ॥

(ব্যঙ্গার্থে)

নখে তিনকাল দিষ্টিতে বকমরে ঝুলিতে সিঁদকাটি ।"

"হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"—তারাশঙ্কর

ন চাষা সজ্জনায়তে ॥ ২৪২ ॥ [দে—৪৪৫৪]

ইহার সম্পূর্ণ পাঠ—

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে দোলায়াং যদি গচ্ছতি ।

তথাপি জাতিমাহাত্ম্যাৎ ন চাষা সজ্জনায়তে ॥

নছত্তর নবত্তর করা ॥ ২৪৩ ॥

=ন ছত্র ন বস্ত্র করা, তছনছ করা ।

নটখটী ॥ ২৪৪ ॥

নড়ল ডোঙা ত ডুবল পোঙা ॥ ২৪৫ ॥ [দে—৪৪৬০]

শুদ্ধ পাঠ—নড়ল পোঙা ত ডুবল ডোঙা। অর্থাৎ ডিঙিখানি এতই পলকা যে ছেলে নড়িলেই ডুবিয়া যায় ।

ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে' মাখা ॥ ২৪৬ ॥

১ নিম পাতায় ও গিমে শাকে । এই প্রবাদটির সহিত এক চরণ জুড়িয়া তারাশঙ্কর 'রাইকমল' উপন্যাসে ব্যবহার করিয়াছেন—

কালসাপিনীর জিহ্বা যেন বিষে আঁকা বাঁকা ।

নাইক পাঁজি নাইক পুঁথি ।

সাতুই আষাঢ় অম্বুবাচী ॥ ২৪৭ ॥

নাঙ্‌চোর বিবি বাঁদীর খপ্পরে ॥ ২৪৮ ॥ [দে—৪৫৫৫]

পাঠ ঠিক নাই বলিয়া বোধ হয়। নাঙ্‌ শব্দের অর্থ উপপতি। বিবি নাঙের সন্ধানে বাঁদীকে পাঠান। বাঁদী তাহাতে ভাগ বসাইতে গিয়া বিবির নজরে পড়ে ইহাই স্বাভাবিক। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ—নাঙ্‌চোর বাঁদী বিবির খপ্পরে।

এই ধরণের বহু প্রাচীন কথা ও কাহিনী আছে।

নাটা মেয়ে খামের খুঁটি

খায় দায় সরল পুঁটি ।

ঢ্যাঙা মেয়ে দিলদরিয়া

খায় না পেট ভরিয়া

মরে যায় টুস্‌ করিয়া ॥ ২৪৯ ॥

নাড়ী কাটতে স্তাজটাও কেটেচে।
ধাই মাগী কি ভুল করেচে ॥ ২৫০ ॥
'পাঁচু ঠাকুর'—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাড়ী কাটা তক্ অভ্যাস ॥ ২৫১ ॥
চাষার ঘরে তামাক দিয়ে নাড়ী কাটে—অর্থাৎ চাষার ছেলে জন্মিয়াই তামাক খাইতে শেখে।

নামে কুকুর পোষা / থুথু ফেলা ॥ ২৫২ ॥

না যাব নগর।
না হবে ঝগড় ॥ ২৫৩ ॥

নাস্তানাবুদ করা ॥ ২৫৪ ॥

নাসে মাসে উপবাসে।
এই তিনে সর্দ্দি নাশে ॥ ২৫৫ ॥

নিকুচি (নকুছ) করা ॥ ২৫৬ ॥

নিমখাসা ॥ ২৫৭ ॥

নিয়ে আয় ত বউ নোড়া
যাই কোঁদলের পাড়া ॥ ২৫৮ ॥ [দে—৪৬৯১]
ইহার পর দুই চরণ—
সাজা লো সাজা লো ঘোড়া
যাইব উত্তর পাড়া ॥
অবশিষ্ট অংশের জন্য [দে—৫২৫৬] দ্রষ্টব্য।

নীচে খই উপরে দই
তুমি আমার জন্মের সই ॥ ২৫৯ ॥
সেকালের সয়লা অনুষ্ঠানে সই পাতাইবার ছড়া।

নীলের ঘরে জ্বেলে বাতি।
জল খাওগে পুত্রবতী ॥ ২৬০ ॥

নীলের দাদন যোবার জ্যালা ॥ ২৬১ ॥

নূতন বস্ত্র পুরানো অন্ন।
তোমার কৃপায় জীবন ধন্য ॥ ২৬২ ॥

নেবার বেলা ছিনে জোঁক।
দেবার বেলা পুত্রশোক ॥ ২৬৩ ॥ 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'—অবধূত

নেবু কলা করুন্দে।
তিন নিয়ে সুকিন্দে[১] ॥ ২৬৪ ॥

১ সুগন্ধা, হুগলী জেলার গ্রামবিশেষ।

ন্যাওটো গোপাল / ন্যাওটো ॥ ২৬৫ ॥

ন্যাকরা বাজ ॥ ২৬৬ ॥

পক্ষিরাজের পক্ষাঘাত ॥ ২৬৭ ॥

পথও চিনি ঘাটও চিনি
কপাল দোষে মরে আছি ॥ ২৬৮ ॥

পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে খোঁপায় ভোলে বর।
নাতনী লো তোর খোঁপা দেখে সতীন জ্বর জ্বর ॥ ২৬৯ ॥

সম্ভবত এই জাতীয় ছড়া হইতে চৌবন্দী খোঁপার নাম হইয়াছিল 'সতীন জ্বালানে খোঁপা'।

পরমায়ু পরম ওষুধ ॥ ২৭০ ॥

পরে পরেই মড়ক কাটানো ॥ ২৭১ ॥ [দে—৪৮৭৬]

গ্রামের মড়কে কার ঘরে কে মারা গিয়াছে খোঁজ করিতে গেলে এক বুড়ী বলিয়াছিল তার আপনার কেহ মরে নাই, মড়কে মরিয়াছে জামাই ও ছেলের বৌ, তাই পরে পরেই মড়ক গিয়াছে। এই গল্পটি জানা না থাকিলে প্রবাদটি বোঝা যায় না।

প্রত্যহ অপ্সরা দেখলে তাতে আর মন টলে না ॥ ২৭২ ॥—দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী—
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি ॥ ২৭৩ ॥

পাকা হর্তুকী খাওয়া ॥ ২৭৪ ॥

পাখী জুখী খাইনে আমি ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্চি বৃন্দাবন ॥ ২৭৫ ॥

ইহারই অন্য পাঠ—
কাঁটা খেয়েচি মুড়ো খেয়েচি ধর্ম্মে দিয়েচি মন।
নাতিপুতিতে নিয়ে যাচ্চে শ্রীবৃন্দাবন ॥

গল্পে গলায় দড়ি বাঁধা বিড়ালের উক্তি।

পাখী পাখী পাখী[1]
সতীন মরে নীচেয়
আমি ওপর থেকে দেখি ॥ ২৭৬ ॥

[1] পাঠান্তর—ঢেঁকি, ঢেঁকি, ঢেঁকি
সতীন …ইত্যাদি।

পাজীর পাঝাড়া ॥ ২৭৭ ॥

পাটা বুকো / পাষাণ বুকো ॥ ২৭৮ ॥

"মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর"—শঙ্কর কবিচন্দ্র

"পাষাণ বুকো অলপ্পেয়ে এত ধন হারালে পেচয়"—দাশু রায়

পাতে দিলে চিলে ছোঁ দেয় ॥ ২৭৯ ॥

=তাড়াতাড়ি খাওয়া।

পান না কাচা দীক্ষাগুরু।

যা করিবেন শয্যাগুরু ॥ ২৮০ ॥

পানের খিলি রসের ঠিলি' ॥ ২৮১ ॥

খেজুর রসের ভাঁড়।

পায়ে কাক বাঁধা ॥ ২৮২ ॥

"আপনি এমন পায়ে কাক বেঁধে বেড়াতে এসেচেন কেন?"

'মায়াজাল'—রামপদ মুখোপাধ্যায়

পায়ের নখের যুগ্যি নয়

পায়ে আলতা পরাবার যুগ্যি নয় ॥ ২৮৩ ॥

"কাঞ্চন তার বাঁ পায়ে আলতা পরাতে পারে না"—'সধবার একাদশী'

পাঁচ কড়া করে গোণ, না আমি গ্ন্যাকা।

তিন কড়া করে গোণ, না হকের এক কড়া যায় যে ॥ ২৮৪ ॥

পাঁচে ধরে বত্রিশে খায়

আর সকলে রস পায় ॥ ২৮৫ ॥ [দে—৪৯৮৮]

অর্থ দেওয়া না থাকিলে বোঝা কঠিন। খাদ্যবস্তু পাঁচ আঙুলে ধরিয়া বত্রিশ দাঁতে চিবাইয়া খাইলে আর সকলে অর্থাৎ সারা শরীর রস পাইয়া পুষ্ট হয়।

পাঁচ পাঁচি ॥ ২৮৬ ॥

পিপু-ফিশুর দল ॥ ২৮৭ ॥

=কুঁড়ের দল।

ঘরে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া এক কুঁড়ে সংক্ষেপে বলিল পি পু অর্থাৎপিঠ পুড়িল, অন্যজন জবাব দিল ফি শু অর্থাৎ ফিরে শুই।

পিরীত আগুন কাম

রয় না প্রকাশ ॥ ২৮৮ ॥ [দে—৫১২৫]

ভুল পাঠ। "রয় না অপ্রকাশ" হইবে।

পিরীতি ভুল্য কাঁটাল কোষ।

বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ ॥ ২৮৯ ॥

পিরীতের সুঁদরি কাঠ।
আহা সঙ্গে নিয়ে পুড়ে মরি ॥ ২৯০ ॥
পুকুর চুরি ॥ ২৯১ ॥ [দে—৫১৪৩]

মূলের অর্থ—"খননের পরিধির মধ্যে পুকুর থাকিলে একটু একটু করিয়া সংলগ্ন খনিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না।" এই অর্থ অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বোধ হয় ঠিক নহে। ঠিক অর্থ—যে পুকুর আদৌ কাটান হয় নাই, তাহার খাতে খরচ দেখাইয়া সমস্ত টাকা বেমালুম চুরি।

পুন্নিমে না যেতে যেতে আমাবস্তে এল।
যেতো রুগীদের আর কোনদিন বা ভাল ॥ ২৯২ ॥

'শাশ্বত পিপাসা'—রামপদ মুখোপাধ্যায়

পুঁয়ে পাওয়া ॥ ২৯৩ ॥

পুরের সর্ব্বনেশে।
পুরোহিতের বেশে ॥ ২৯৪ ॥

তুলনীয়—
পুরীষস্য চ রোষস্য হিংসায়াঃ তস্করস্য চ।
আদ্যাক্ষরাণি আদায় বেধাশ্চক্রে পুরোহিতম্ ॥

পূর্ণিমা তুল্য রাতি।
ব্রাহ্মণ তুল্য জাতি ॥ ২৯৫ ॥

পেটটা বইত মোটটা নয়।
আর ঠেসো না মহাশয় ॥ ২৯৬ ॥

পেটে আসছে মুখে আসছে না ॥ ২৯৭ ॥

পেটে পা দেওয়া ॥ ২৯৮ ॥

=চেপে ধরা।
"এক ঘাট লোকের মাঝে হরির মায়ের পেটে পা দিয়ে এলুম"।

—রামপদ মুখোপাধ্যায়

পেঁড়ো থেকে আনলুম রাঁধুনী।
রাঁধুনী বলে ভাতে জল দোব কতখানি ॥ ২৯৯ ॥

পেতে দিলে গুণ[১]
অমনি এল ঘুম ॥ ৩০০ ॥

১ চট।

পোলোয়া কিম্বা পোস্ত।
যখন যেমন রেস্ত ॥ ৩০১ ॥

হিন্দীতে—কভি কভি ডাল রোটী
কভি কভি চানা
কভি ওহি ভি মানা ॥

পোষড়ার তত্ত্বে শিউলি[১] চাই ॥ ৩০২ ॥

১ যে খেজুর রস পাড়ে। অর্থ—অন্যায় আবদার।

এই বিদ্রূপাত্মক প্রবাদটিই ভাঙিয়া রসরাজ অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

"কল্‌কেতার কোন মেয়ের বাপ জামাইবাড়ী পোষড়ার তত্ত্বে একেবারে দশ বারটা খেজুর গাছ আস্ত তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সবগুলোর গলা ধরে এক একটা জ্যান্ত শিউলি ঝুলছিল।"—'গ্রাম্যবিভ্রাট'

ফচকে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি ॥ ৩০৩ ॥

"ফচ্‌কে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি মড়ি পোড়াণীর ঝি।
বিয়ের সময় বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি ॥"—দীনবন্ধু

ফষ্টিনষ্টি ॥ ৩০৪ ॥

ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা ॥ ৩০৫ ॥

ফুট্‌ করল কি? কাঁটাল বীচিটি।
দেনা বউ খাই। পুড়ে হোল ছাই ॥ ৩০৬ ॥

ফুল ফুটেচে উঁচু ডালে।
পাবে নাকো হাত বাড়ালে ॥ ৩০৭ ॥—গোপাল উড়ে

ফুলের দায়ে ছোট গলায় ॥ ৩০৮ ॥ [দে—৫৩৫৮]

পাঠ ভুল। শুদ্ধ পাঠ—ছটা হইবে।

ছটা, ছোটা বা সটা বলিতে কলাপাতার মাঝখানের শক্ত আঁশ বুঝায়; যাহা দিয়া কিছু ঝুলাইয়া বা গাঁথিয়া রাখা যায়, মালা গাঁথিতে ব্যবহার হয়। তাই ইহার অর্থ—স্ত্রীর দায়ে শাশুড়ীকে সহ্য করা।

ফৈজৎ অষ্টকুটি / চৌষট্টি ॥ ৩০৯ ॥

"ময়ূরপুচ্ছ পোড়াও, তাকে কাঁসার ঘটিতে পোর, চৌষট্টি ফৈজৎ ॥"
'অপরাজিত'—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বউটি ভালো-কালো[১]।
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করিব আলো ॥ ৩১০ ॥

১ পাঠান্তর—পুঁটু নাকি কালো।

বউটি ভালো বটে।
টোক্‌না খেয়ে বাটনা বাটে ॥ ৩১১ ॥ [দে—৫৩৭৫]

মূলে টোকুনা শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'আঘাত' কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যাহা টুকিয়া টুকিয়া খাওয়া হয় তাহাই টোকনা, অর্থাৎ মুড়ি বা জলপান।

বউ তিন থালা ভাত একলা সাঁটে
বউ খাওয়া দাওয়ায় পোক্ত বটে।
ছেলে এলে খেটে
এঁটো খাবে চেটে ॥ ৩১২ ॥

বউ ভাত রেঁধেচে চোঁয়া পোড়া,
ডাল রেঁধেচে তিনটি কড়া।
তবু রাঁধে রাঁধে বলে পড়েচে সাড়া ॥ ৩১৩ ॥

বউ শুখো চিংড়ী খায়
ভটর ভটর চটর চটর
গঙ্গাস্নানে যায় ॥ ৩১৪ ॥

বউ হয়েচে রঙের বিবি ভাশুর মানে না ॥ ৩১৫ ॥

বউয়ের কথা বলব কি গো দাদা
তার ধান ভেনে ভেনে পা গোদা।
আহা বউয়ের কি যে গুণ
পান্তাভাতে পুড়িয়ে দিত
কাল কাল বেগুন ॥ ৩১৬ ॥

বট তুল্য ছায়া
সন্তান তুল্য মায়া ॥ ৩১৭ ॥

বড় বউ বড়ালের ঝি ॥ ৩১৮ ॥ [দে—৫৪২১]

ইহার একটি পাঠান্তর—

বড় বউ বড়ালের ঝি কোণে বসে কর কি ?
দুধ আউটে করি ক্ষীর সকল বর্ত্ত ধরি শির।
মেজ বউ মেজের মাটি, সকল কথায় ঝেঁঝে উঠি।
সেজ বউ সাজালের দান, সকল কথায় করে যান।
ন বউ নত্তা, সকল কাজের কত্তা।
নতুন বউ নতুনী, সকল কথার বাঁধুনী।
ছোট বউ বেজায় ধাড়ী, বরের হাত ধরে চাপলেন গাড়ী ॥

বক্কলে[১] মুলুক।
আগুন লেগে পুড়ুক ॥ ৩১৯ ॥

১ মিথ্যাবাদী জোচ্চোর। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ে 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে 'বক্কলে' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

বর বর তোমার ক'খানি ঘর।
আমি গিয়েই হব স্বতন্তর ॥ ৩২০ ॥

বল ঠাকুরঝি আমারে।
ভোলা রইল তোমারে ॥ ৩২১ ॥ [দে—৪১০৪ তুলনীয়]

বলা মুখ আর চলা পা ॥ ৩২২ ॥

বলিহারি বঙ্গনারী ॥ ৩২৩ ॥

বাঘ ভালুকে ভয় নাই।
ঢেঁকি দেখে ভয় পাই ॥ ৩২৪ ॥ 'মহারাজ নন্দকুমার'—চণ্ডীচরণ সেন।

বাঘাটি[১] খানকি পাড়া,
কোলাগাঁ[১] লক্ষ্মী ছাড়া
জয়পুরেতে[১] মদের হাঁড়া ॥ ৩২৫ ॥

১ হুগলী জেলার গ্রামবিশেষ।

বাঁজাতক / খাটুনি ॥ ৩২৬ ॥

বাঁজার সাধ খেয়ে পোয়াতি কবলানো ॥ ৩২৭ ॥

বাজুবন্ধ পৈঁছে খাড়ু
সতীনের মুখে সাত ঝাড়ু ॥ ৩২৮ ॥

বাড়া ভাতে ছালি ॥ ৩২৯ ॥ [দে—৫৫৯২]

পাঠান্তর—
আইবুড়ো শালী
ধোপকাপড়ে কালি ॥

বাপ মরেচে বালাই গেছে।
কোন শালার বা ধারি ধার ॥ ৩৩০ ॥—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

বাপ রাজা ত ঝিয়ের কি।
ভাই রাজা ত বোনের কি ॥ ৩৩১ ॥ [দে—৫৬৬৭]

পাঠান্তর—
বাপ রাজা ত রাজার ঝি।
ভাই রাজা ত বোনের কি ॥

বাপে করবে নান্দীমুখ।
তবে হবে বিয়ের সুখ ॥ ৩৩২ ॥

বাপের ঘরের ঝি
আদর করবো না ত কি।
আদরের হয়েচে বা কি,
দেখসে পাতনা পেতেচি ॥ ৩৩৩ ॥

বাপের ভাতে / হোটেলে থাকা ॥ ৩৩৪ ॥
বাপের বাড়ীর কাকটাও সাদা ॥ ৩৩৫ ॥
বাবা পেটে খুড়ো হাঁটে।
তখন আমি বছর আটে ॥ ৩৩৬ ॥
বারোটা বেজে যাওয়া ॥ ৩৩৭ ॥
বাঁ হাতের ব্যাপার ॥ ৩৩৮ ॥

=ঘুষ, উপরি আয়।

বাঁশি যাবে হাসি যাবে।
চূড়া যাবে চূড়ান্ত হবে ॥ ৩৩৯ ॥
বিধিরে তোর বুদ্ধি বড় মোটা ॥ ৩৪০ ॥

তুলনীয়—ধাতুঃপুরে ন কোঽপি বুদ্ধিদাতা ॥

বিয়ের বাকি মাস পাঁচ ছয়।
কাপড় তোলে হাত পাঁচ ছয় ॥ ৩৪১ ॥ [দে—৫৮৫৪]

প্রথম চরণের শুদ্ধ পাঠ—

বিয়েতে বাকি মাস পাঁচ ছয়।
বিষয় বোঝার ভূশণ্ডী ॥ ৩৪২ ॥
বুক দশ হাত হওয়া ॥ ৩৪৩ ॥
বুড়ো আঙুল চোষানো ॥ ৩৪৪ ॥

=ঠকানো।

বেগুনের নাম প্রাণনাথ ॥ ৩৪৫ ॥

"বাঙাল বউ যাত্রা দেখে।
বেগুনকে ডাকে প্রাণনাথ হে ॥"

বেড়াল একে কালো
তায় গাঙ্ সাঁতরে এলো
তায় পাঁশ গাদায় শুলো
রূপেতে জগত আলো ॥ ৩৪৬ ॥
বেড়ি বেড়ি বেড়ি
সতান মাগী চেড়ী ॥ ৩৪৭ ॥
বেয়ারিং ইয়ারকি দেওয়া ॥ ৩৪৮ ॥
ব্যাটা বক্কেশ্বর ॥ ৩৪৯ ॥
ভক্ত বিটেল / বিট্‌লে বামুন ॥ ৩৫০ ॥

বিটেল শব্দটি কি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ ভক্ত বিট্‌ঠল হইতে আসিয়া ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হইতেছে?

ভগবানের চিড়িয়াখানা ॥ ৩৫১ ॥

ভদ্র হয়ত কাব্য করি ॥ ৩৫২ ॥ [দে—৬১১১]

ইহার মূলে রহিয়াছে রামেশ্বরের শিবায়নের উক্তিটি

'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর'

ভাঁড়ে তেলও থাকুক।

মাথায় রুখোও ঘুচুক ॥ ৩৫৩ ॥

অনুরূপ ওড়িয়া প্রবাদ হইতে আসিয়াছে।

ভাদ্দর বৌ আর বালিশ দুই বজায় রাখা ॥ ৩৫৪ ॥

"এদিকে খাবেন ব্রাণ্ডি ওদিকে মস্তরের ধুম দেখ। শোবেন ভাদ্দর বোয়ের কাছে মাঝে একটা বালিশ রেখে।"

—'সধবার একাদশী'

ভাত এমন চিজ।

খোদাসে উনিশ বিশ ॥ ৩৫৫ ॥ [দে—৬১৭২]

পাঠান্তর—

রূপৈয়া ঐসন চিজ

ভুজং ভাজং দেওয়া ॥ ৩৫৬ ॥

"ভুজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপ্যাল বিলে"—হেমচন্দ্র

ভুবনের মাসী ॥ ৩৫৭ ॥

মাসি, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ—বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ

মন গেল আমার কাঁকড়া দানায়।

কাজ কি এখন হরিসাধনায় ॥ ৩৫৮ ॥

মনেতে যৌবন যার

ভাবনা কোথায় তার।

মাথায় পাকা চুল

তবু খোঁপায় ঘেরা ফুল ॥ ৩৫৯ ॥

মরব না লো বিনোদিনী কৃষ্ণ যার সখা

একমরণে দুজন মরব মরব না লো একা।

তখন ভাবে বলেছিলুম মরব

এখন থাকবি থাক যাবি যা

যা হয় একটা করব ॥ ৩৬০ ॥

মরবার কালে বঙ্গদেশ ॥ ৩৬১ ॥

"মরবার কালে গঙ্গা ফেলে বঙ্গদেশে চললে ?"—দাশু রায়

মরি কি ঝালিয়ে তুলেচ।
ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেচ ॥ ৩৬২ ॥

মাইকেল মানে টাইটেল ॥ ৩৬৩ ॥

মাকে দোব পাটের শাড়ী
বাবাকে দোব ঘোড়া।
সইমা[১] গো কোর না গোসা
তোমাকে দোব পুঁটি মাছের রসা ॥ ৩৬৪ ॥

১ সৎমা গো, মাসীমা গো ইত্যাদি পাঠও প্রচলিত।

মা গঙ্গা তারিণী।
যখুনি নাবি তখুনি বারুণী[১] ॥ ৩৬৫ ॥

১ দোল বারুণীর স্নানযোগ

মাগের ভেড়ো ॥ ৩৬৬ ॥

মাছের মধ্যে দাড়া।[১]
জাতের মধ্যে ধাড়া ॥ ৩৬৭ ॥

১ গাঙদাড়া=নিকৃষ্ট মাছ বিশেষ

মান্নাদের জাত / যাত
কে দেয় কার পোঁদে হাত ॥ ৩৬৮ ॥ [দে—৬৬৮৯]

পাঠ ভুল ! "মানাদের যাত"ই শুদ্ধ পাঠ।
হুগলী জেলার মহানাদ বা মানাদ প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেখানে জটেশ্বর মহাদেবের মেলায় খুব ভিড় হয়। ঐ উৎসবকে 'মানাদের যাত' বলা হয়।

মামা দিলে দই সন্দেশ গোয়ালে বসে খাই।
মামী এল হুড়কো নিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাই ॥ ৩৬৯ ॥

মামাদের কোঠাবাড়ী।
তেল হলুদের ছড়াছড়ি ॥ ৩৭০ ॥

মার কাটারি / লাঠি ॥ ৩৭১ ॥

মাসী পিসীর বাড়ী নয় যে চলে যাব হে।
এ বাবা যমের বাড়ী পথ চেনাবে কে ॥ ৩৭২ ॥

[দে—৭০৭০ নং প্রবাদটি ঠিক ইহার বিপরীত]

মিথ্যের চাষ ॥ ৩৭৩ ॥

মুলে বউ নারানী বলে না।
ঠাকুরঝি শুনতে সাধ ॥ ৩৭৪ ॥

মেয়ে ছানা নয় মোয়া ছানা ॥ ৩৭৫ ॥

মেয়ে জ্যাঠা বড় বালাই ॥ ৩৭৬ ॥

মেয়েদের ষষ্ঠী করা।

চেষ্টা কেবল ফলার মারা ॥ ৩৭৭ ॥

মেয়ের কত ঢঙ্‌, তেলাকুচো সঙ্‌॥ ৩৭৮ ॥ [দে—৬৯১৮]

তেলাকুচো সঙ্‌ পাঠ ঠিক নহে, রঙ হইবে। তেলাকুচোর পাকা ফল দেখিতে অতি সুন্দর, টুকটুকে লাল।

মেয়ের নেই হাজা শুকো।

ফরসা কাপড় পরলে যেন বাঁধা হুকো ॥ ৩৭৯ ॥

মেয়ে যেন রাগী সন্দেশ ॥ ৩৮০ ॥

ইহারই পাঠান্তর—

বেয়ান বড় ঘাগী।

মেয়ে দিয়েচে রাগী ॥

"দিদির শাশুড়ী দিদিকে দেখে বল্লেন, কুটুম বাড়ী থেকে রাগী সন্দেশ দিয়েচে—অর্থাৎ একটু নিরেস।" 'সেকালিণীর স্মৃতিকথা'—জ্যোতির্ময়ী দেবী (মহিলামহল, ১৩৭০)

মেয়ে হব ঘর নিকুব পরব পাটের শাড়ী।

খড় খড়েতে চড়ে যাব রাজা শ্বশুরের বাড়ী ॥ ৩৮১ ॥

মৈত্রকুল শিবতুল বাগ্‌চী কুল শাদা।

সান্ন্যাল বংশ ঘোর পাগলা লাহিড়ী হারামজাদা ॥ ৩৮২ ॥

তুলনীয় মূলগ্রন্থে—

মুখুটি কুটিল বড় বন্দ্যঘটি শাদা।

[দে—২৮৬০ এবং ৬৮২৩]

ইহার অনুরূপ কায়স্থ সমাজে প্রচলিত—

ঘোষ বংশ বড় বংশ বোস বংশ দাতা।

মিত্তির কুলীন বংশ দত্ত হারামজাদা ॥ ৩৮৩ ॥

পুনশ্চ—

দত্ত কারও ভৃত্য নয় ॥ ৩৮৪ ॥—সধবার একাদশী

মোক্ষ ফল ফেলে মোচা ফল ধরা ॥ ৩৮৫ ॥

মোচ কামিয়ে মড়া হালকা করা ॥ ৩৮৬ ॥

যখন তখন করে পাপ।

সময় পেলে ফলে পাপ ॥ ৩৮৭ ॥

মূল সংস্কৃত বচন—

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।

রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

দুধ দুহিলেই দুগ্ধ পাইত সদ্যই।

কিন্তু অধর্ম্মের ফল মেলেনা অদ্যই॥

যজমেনে বামুনের রীত।

দিলে থুলেই বড় পিরীত॥ ৩৮৮॥

যত চুল তত পেরমাই[১] হোক॥ ৩৮৯॥

১ পরমায়ু

যদি বল ছাড়-ছাড় আমি না ছাড়িব॥ ৩৯০॥—কৃত্তিবাস

যমরাজার বৈমাত্র ভাই॥ ৩৯১॥

যবেস্ববে॥ ৩৯২॥

শালকে যবে স্ববে

চটে দিয়েচেন মার্কা।—দাশু রায়

যা করেন মা ধান্যেশ্বরী॥ ৩৯৩॥

যার ভাতারের দাম বারো আনা।

তার মাগের দেখ বিবিয়ানা॥ ৩৯৪॥

যার যত পাপং।

নরোত্তমে চাপং॥ ৩৯৫॥—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

"কালিদাস গ্রন্থাবলী"র ভূমিকা।

যে ঘরেতে বাস করি।

হরি বলতে প্রাণে মরি॥ ৩৯৬॥

যেথা করেন চণ্ডীপাঠ।

ভিটে বেচে বসান হাট॥ ৩৯৭॥ [দে—৭৩৫০]

অনুরূপ সংস্কৃত বচন—

ত্বয়া ন পঠিতা চণ্ডী ময়া নাপি চিকিৎসিতম্।

অকস্মাৎ নগরোপান্তে কথং প্রজ্বলিতা চিতা॥

যে দেয় তার হাত ধন্যি।

যে টোকে তার শাপ মন্যি॥ ৩৯৮॥

যে ধনে নেই কাজ।

সে ধনে পড়ুক বাজ॥ ৩৯৯॥

যে ফুলে যে দেবতা তুষ্ট।

সেটি জানলে ঘোচে কষ্ট॥ ৪০০॥

যে বলে ছারগোকা—তার হই কোলের খোকা।
যে বলে ছার—তার কাছকে না যাই আর ॥ ৪০২ ॥
যেমন করে পর কাপড় চৈত্রে হবে কানি।
যেমন করে বাঁধো ধান ভাদ্রে টানাটানি ॥ ৪০২ ॥—তারাশঙ্কর
যেমন কালিদাস তেমন মল্লিনাথ ॥ ৪০৩ ॥—দীনবন্ধু
যেমন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তেমন কৃষ্ণ নটবর ॥ ৪০৪ ॥
যেমন ব্রত তেমন কথা / দক্ষিণা ॥ ৪০৫ ॥
যেমন শূয়োর তেমন খেটে[১] ॥ ৪০৬ ॥

১ শক্ত ছোট লাঠি

যৌবন জোয়ারের পানি
কাল থাকতে বুঝলে না নানী ॥ ৪০৭ [দে—৭৪৯৮]

পাঠান্তর—
যৌবন জোয়ারের জল।
দেখতে দেখতে ঢলাঢল ॥

রজকের বিশ্বকর্ম্মা ॥ ৪০৮ ॥—দাশু রায়

ধোবার বিশ্‌কর্ম্মা—রাম বসু

রথে এক পা পথে এক পা ॥ ৪০৯ ॥

—অধীর প্রতীক্ষা।—লক্ষ্মীর ব্রতকথা দ্রষ্টব্য

রসের মরাল ॥ ৪১০ ॥
রাগে বাঁজী পুত বিইয়েচে ॥ ৪১১ ॥ [দে—৭৫৪০]

পাঠান্তর—রাগের জ্বালায় কিনা করতে পারি।
কেবল পুত বিয়োতেই নারি ॥

রাঙা শুকুরবার ॥ ৪১২ ॥
রাঙের রাধা ॥ ৪১৩ ॥
রাজা চুলকোয় প্রজা চুলকোয়
চুলকোয় রাজার সাত রাণী
চুলকোতে চুলকোতে চলল
গোটা রাজ্য রাজধানী।
হায়রে সাধের চুলকুণি ॥ ৪১৪ ॥
রাজার পড়লেও রাণী হয় না।
পাতে পড়লেও খেতে পায় না ॥ ৪১৫ ॥

রাজার পুকুরে দুধ ঢালা ॥ ৪১৬ ॥

রাজার মায়ের সাজার কথা ॥ ৪১৭ ॥

রামাশ্যামা মিষ্টি বড় ভাতার বড় টক ॥ ৪১৮ ॥—ভবানী ঝুমুরওয়ালার গান

রাঁড়িভুড়ির বাড়ী— ॥ ৪১৯ ॥

তখন রাঁড়ি ভুড়ির বাড়ী কান্নাকাটি পড়িয়া গেল, ময়না কোথায়—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

"আচারবিচের শিখবে কবে রাঁড়িভুঁড়ির বাড়ী"

'মহাভারতী'—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

রাঁধাবাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই ॥ ৪২০ ॥

লাউ করে হাউ হাউ কে রেঁধেচে ?

আমি ত রাঁধিনি বাবা বউ রেঁধেচে।

তাই ত অভাগা লাউ মধু হয়েচে ॥ ৪২১ ॥

লাজে বউ চুবড়ী।

পাদে যেন ডুবড়ী ॥ ৪২২ ॥ [দে—৭৭৪৭]

লুচির উপর পড়ল চিনি।

মেঘের কোলে সৌদামিনী ॥ ৪২৩ ॥

=পাকা ফলার

লোকে বলে কাল খেঁদী।

যার বউ তার পরম নিধি ॥ ৪২৪ ॥

লোহার সিন্দুকবাগে চায়।

গিয়ে শাক দিয়ে ভাত খায় ॥ ৪২৫ ॥

শশা বেচুনি বেচত শশা।

তার হয়েচে সুখের দশা ॥ ৪২৬ ॥ [দে—৭৮৫৭]

ইহার পরবর্তী আরও দুইটি চরণ—

এলাচ লঙ্গ দিয়ে খাচ্ছে পান।

ভানবে না আর তোদের ধান ॥ ৪২৭ ॥

শান্তিপুরে লৌকতা ॥ ৪২৮ ॥

ইহার অনুরূপ পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রবাদের জন্য [দে —৬০২৫] দ্রষ্টব্য

শাশুড়ীকে পেন্নাম করতে সুতো খাইটে কামাই যায় ॥ ৪২৯ ॥

শিখণ্ডী খাড়া করা ॥ ৪৩০ ॥

শিবকে যোগ শেখান ॥ ৪৩১ ॥

শিবের বেলপাত কামাই যাওয়া ॥ ৪৩২ ॥

শুকুরের হাঁড়ি কুকুরে খায়।
সোমের হাঁড়ি যমে নেয় ॥ ৪৩৩ ॥

শেয়ালের যুক্তি ॥ ৪৩৪ ॥ [দে—৮০০২]

মূলের ব্যাখ্যা ঠিক হয় নাই। জ্যোৎস্না রাত্রে শেয়ালেরা প্রায়ই গোল হইয়া বৈঠক করে। তাই ইহার অর্থ আড়ম্বরপূর্ণ নিষ্ফল যুক্তি।

শোনরে শোন দশরথের পো।
রামের দুই হাত বেঁধে থো ॥ ৪৩৫ ॥—কারণ রামের চুলকাণি হইয়াছে।

শ্রীচরণের চুটকি ॥ ৪৩৬ ॥—'জামাই বারিক'

শ্রীচরণের ছুঁচো ॥ ৪৩৭ ॥—স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীমন্দিরে ঢোকা ॥ ৪৩৮ ॥

ষোল ছেল পোলুয়ে[১]—
কি করে গেল পালিয়ে ॥ ৪৩৯ ॥

১ পোলো বা পোলুই যাহা দিয়া জীওলমাছ ধরা হয়। ষোল কইয়ের হিসাবের জন্য যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' দ্রষ্টব্য। ইহার অংশ বিশেষ প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যেমন—

তুই যদি হোস ভাল মানুষের পো ॥
তবে কাঁটাখান খেয়ে মাছখান থো ॥ ইত্যাদি

সকল ফল ডালে
আম খাবে পালে ॥ ৪৪০ ॥

অনেক উৎকৃষ্ট আমই গাছপাকা খাইতে নাই। বাড়ীতে আনিয়া অনেক তোয়াজ করিয়া তৈয়ার করিতে হয়।

সঙের পেরু ॥ ৪৪১ ॥

"ঐ সঙের পেরুটাকে কেন বিয়ে করতে যাব"। 'ত্রিধারা'

—সমরেশ বসু

সঞ্চয়ের ধন কিসে যায়।
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে খায় ॥ ৪৪২ ॥

সতাত বাপ ॥ ৪৪৩ ॥

সতী পায় না ধুতি ॥ ৪৪৪ ॥

তুলনীয়—
সতীকো ধোতি মিলে না
কসবী পৈহরণে খাসা ॥

সতীত্বের চুবড়ি ॥ ৪৪৫ ॥—দীনবন্ধু

সত্যপীর এসেচেন চেরাগ জ্বেলে ॥ ৪৪৬ ॥

'প্রথম কদম ফুল'—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

সব সুখই আছে।

যা দুঃখ অন্নবস্ত্রের ॥ ৪৪৭ ॥

সভায় লাগে দাঁত কপাটি।

নামটি সুন্দর ত্রিপাঠী ॥ ৪৪৮ ।—ওড়িয়া প্রবাদ হইতে

সভ্যতায় সাঁওতাল বুদ্ধিতে উড়ে।

বজ্জাতিতে বাখরগঞ্জ লজ্জায় কুকী ॥ ৪৪৯ ॥ —দীনবন্ধু মিত্র

তুলনীয়—

দ'খনে বজ্জাত

ছ'গণ্ডা পরগণার মামলাবাজ। ইত্যাদি

সময়ে শোকে মাটি পড়ে ॥ ৪৫০ ॥

সম্মুখ সুন্দর দত্তের ঝি।

হাগছ মুতছ সচ্‌ছ নি ॥ ৪৫১ ॥

স্বপ্নে পোলাও খাবে তাও ঘি দেবে না ॥ ৪৫২ ॥—সৈয়দ মুজতবা আলি

স্বস্থানে পরমেশ্বরী ॥ ৪৫৩ ॥

সর্ব্বঘটে কাঁটালি কলা ॥ ৪৫৪ ॥

সাউখুড়ি করা ॥ ৪৫৫ ॥

সাউখুড়ি করেন একটা

মিথ্যের ধুকড়ি ওটা ॥—দাশু রায়

সাকারা সুন্দরী ॥ ৪৫৬ ॥

সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ॥ ৪৫৭ ॥ 'প্রফুল্ল'—গিরীশ ঘোষ

সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে।

যে আমাদের অমুককে খোঁড়ে

তার মুখ ছ্যাঁক ছোঁক পোড়ে ॥ ৪৫৮ ॥

সাঁঝের বেলা জলকে গিয়ে এলিয়ে গেল চুল।

আমার কি হোল বকুল ফুল ॥ ৪৫৯ ॥

সাতখ্যাংরা এক ভাত খাওয়া ॥ ৪৬০ ॥

সাত পাকের সম্বন্ধ ॥ ৪৬১ ॥

সাত শকুন মরে এক দেওয়ান / দারোগা হওয়া ॥ ৪৬২ ॥

সাদীর প্রথম রাতে বিড়াল মারিবে ॥ ৪৬৩ ॥

ডঃ দে বিড়াল মারার (নং ৬০৩৮) যে অর্থ করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। সৈয়দ মুজতবা আলির গল্প একেত্রে স্মরণীয়।

সাধ্যরোগ ঔষধে নাশে।
অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম ॥ ৪৬৪ ॥
সারাদিন হাটে বাটে
রাত হলে বুড়ী সুতো কাটে ॥ ৪৬৫ ॥ [দে—৮৩৭৪]

পাঠান্তর—রাত হলে ঘোমটা আঁটে।

স্বামীর টীকা পড়েছ স্বামীর কাছে ॥ ৪৬৬ ॥
সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায় ॥ ৪৬৭ ॥

"ছোটবাবু রাস্তা এমন বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়।" 'পল্লীসমাজ'—শরৎচন্দ্র

সুভালাভালি ॥ ৪৬৮ ॥
"সুদর্শন, সব সুভালাভালি রেখো।" 'পথের পাঁচালী'—বিভুতিভূষণ
সুয়াপুর[1] নায়া।
মদে ভাতে পায়া ॥ ৪৬৯ ॥

১ ঢাকা জেলার গ্রাম।

'শ্যামল ও কজ্জল'—দীনেশচন্দ্র সেন

সেই মামা সেই মামী ॥ ৪৭০ ॥ [দে—৮৪৩৩]

অতিরিক্ত চরণগুলি লইয়া ইহার সম্পূর্ণ পাঠ এইরূপ—
সেই মামা সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর
তখন মামী ভাত চাইলে হাঁড়ি কড়কড়।
সেই মামা সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর
এখন মামী ভাত কেন গো ঘিয়ে সরসর ॥

সোনা দিদির আদরে
সর্ব্ব শরীর বিদরে ॥ ৪৭১ ॥
সোনার বাউটী ভাত খাও ॥ ৪৭২ ॥ লক্ষ্মীর ব্রতকথা হইতে
সোনার বাঁধা আগনে।
তাতে বেড়ায় ভাগনে ॥ ৪৭৩ ॥
সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা ॥ ৪৭৪ ॥
সোমবার শ্রাবণমাস শিবের নাম গেয়ে।
পাপ ধোওসে মাগী মিনসে গঙ্গা পানে ধেয়ে ॥ ৪৭৫ ॥
সোয়ামী পটোলের ব্যাপারী
একটি পটোল দেয়না
যে রাঁধি তরকারী ॥ ৪৭৬ ॥

স্মৃতির মত উল্‌টে ফেলে।
মেগের মতেই জগৎ চলে ॥ ৪৭৭ ॥

হট্টমালার দেশ ॥ ৪৭৮ ॥
হদ্দ করলে বৃদ্ধকালে ॥ ৪৭৯ ॥
হরকলা ॥ ৪৮০ ॥
—নানা অসৎ বিদ্যায় পারদর্শী, ওড়িয়া শব্দ।
হরি হে দয়া কর।
যার খাবি তার মরণ কর
তার কোঠা ভেঙে রাস্তা কর ॥ ৪৮১ ॥
হরে-কর-কমবা ॥ ৪৮২ ॥
অর্থহীন শব্দসমষ্টি। হরেক রকম বাজীর ও বারুদের দোকান ইত্যাদি হইতে ভাঙা।
হলা হলা সুন্দরী হাসস কি।
কপাল করেছি ভালা রূপে কাজ কি ॥ ৪৮৩ ॥
হাই তুললে হাত পাতে ॥ ৪৮৪ ॥
হাটে বাজারে ঘর।
হাকিম নাগর তবু পেয়াদাকে ডর ॥ ৪৮৫ ॥
হাটে যাব বুলবুলোব
তাঁত নোব রে।
রুণুঝুণু বালাই হোল রে ॥ ৪৮৬ ॥
হাঁটুসীমা দুধভাত
গলাসীমা কাঁটা।
তবে রে পাইবানে
ঠাকুরালির পাটা / বাটা ॥ ৪৮৭ ॥
হাড় গুঁড়িয়ে খয়ের মোয়া ॥ ৪৮৮ ॥
হাড় মুড়মুড়ি ব্যারাম ॥ ৪৮৯ ॥
হাড় হাবাতে ॥ ৪৯০ ॥
হাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি
আমি যেন হই জন্ম এয়োস্ত্রী
সতীন কড়ে রাঁড়ি ॥ ৪৯১ ॥
হাঁড়ি শিকেয় ওঠা ॥ ৪৯২ ॥ 'নীলদর্পণ'—দীনবন্ধু
হাড়ে মাসে বেটে খাওয়া খাটুনি ॥ ৪৯৩ ॥

হাত তোলায় থাকা ॥ ৪৯৪ ॥

হাত সুড়কৎ ॥ ৪৯৫ ॥

"তোমার হাত সুড়কৎ থাকবে এখন।"

'কলকাতার কাছেই'—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

হাত পা এগুচ্চেনা / গুটিয়ে যাচ্চে—

পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্চে ॥ ৪৯৬ ॥

তুলনীয়—

"ন মে উচিতেষু নিজকরনীয়েষু হস্তপাদং প্রসরতি"—'শকুন্তলা'

হাত বলে আমি খেটে মরি পেট বসে খায়।

পেট বলে আমি হড়কে দিলে কেবা কোথায় যায় ॥ ৪৯৭ ॥

হাতা হাতা হাতা।

খাও সতীনের মাথা ॥ ৪৯৮ ॥

হাতে তামাক / গাঁজা খাওয়া ॥ ৪৯৯ ॥

হাতে হেগে দেওয়া ॥ ৫০০ ॥

=ঘুষ দেওয়া। 'স্বপ্ন'—গিরীন্দ্রশেখর বসু

হাপু গোণা ॥ ৫০১ ॥

শেষে হাপু গুণবে বাপু

তোমার ছিঁড়ে পড়ে যাবে ধৈর্য্যহাল ॥—রূপচাঁদ পক্ষী

হাবুজা গোবুজা ॥ ৫০২ ॥

হারাধনের দশটি ছেলে ॥ ৫০৩ ॥—'হাসিখুশি'র ছড়া

হাসলে ভালুকে শাঁখালু খায় ॥ ৫০৪ ॥—দীনবন্ধু মিত্র

হিংসার কারণে তোর বর্ণ হইল কাল ॥ ৫০৫ ॥

স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ—'পদ্যপাঠ'

হিংসুটে যায় হাটে।

লোক দেখে বুক ফাটে ॥ ৫০৬ ॥

হিমসিম খাওয়া ॥ ৫০৭ ॥

হিরি হিরি পিরি[১] লেগে থাকা ॥ ৫০৮ ॥

১ সামান্য রোগ।—'রূপকথা' হইতে

হীরের বালা মুক্তোর মালা

করবে কত দান

বাটি ভরে দুধ দেবে

বাটা ভরে পান ॥ ৫০৯ ॥

হকুমবরদার ভাতার ॥ ৫১০ ॥

হেই আসচে টাকার ছালা
তাই গুণতে যাবে বেলা ॥ ৫১১ ॥
হেঁজি পেঁজি ॥ ৫১২ ॥
হেঁটেল বন দিয়ে হ্যাঁচড়ান ॥ ৫১৩ ॥—'রূপকথা' হইতে
"আমাদের যেন সেই হেঁটেল বন দিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে যাওয়া"। 'অজন্তা'—অসিতকুমার হালদার
হেজোল দাগ্‌ড়া ॥ ৫১৪ ॥
=ঢ্যাঁটা
"তুই হেজোল দাগা বৌ ত নয়"—অমৃতলাল বসু
হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা ॥ ৫১৫ ॥ [দে—৮৮৩৩]
পরবর্ত্তী চরণের পাঠান্তর—
কুত্তা মারকে ফাঁসি যায়েঙ্গা।
হেসে সূয্যি বসে পাটে।
তার পর দিন চাষা খাটে ॥ ৫১৬ ॥
হোঁদল কুৎকুৎ ॥ ৫১৭ ॥
হ্যাঙ্‌লা কার্ত্তিক ॥ ৫১৮ ॥
মূল ছড়াটি এই—
কার্ত্তিক ঠাকুর হ্যাঙ্‌লা
একবার আসে মায়ের সঙ্গে
একবার আসে একলা ॥
দুর্গাপূজার সময় ছাড়া পৃথক মূর্ত্তি গড়িয়া সেকালের বাঙলা দেশে লক্ষ্মী সরস্বতী বা গণেশের পূজা হইত না। মানসিক থাকায় কার্ত্তিক পূজা ভদ্র এবং অগৃহস্থ উভয় মহলেই বেশ চলিত ছিল। তাই কেবল কার্ত্তিকেরই হ্যাঙলা অপবাদ।
হ্যাঙালি জ্যাঙালি করা ॥ ৫১৯ ॥
=কাকুতি মিনতি করা।
হ্যাঁত ক্যাঁৎ নেই ॥ ৫২০ ॥
=গ্রাহ্য না করা।

পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

(১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অজিতকুমার দে	দাতা	অল্পবুদ্ধি শিশু
অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	সাধনা ও সংস্কৃতি
অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত		গ্রন্থপরিক্রমা ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ
অবিনাশচন্দ্র সাহা (ভারতী লাইব্রেরী)	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য
	রণজিৎকুমার সেন	বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
	তুর্গেনিভ	অনাবাদী জমি ; আবুলকালাম শামসুদ্দীন, অনু°
	ভিনদেশী	কুলীন-কলিকার পাঁচালী
	দাতা	পুবের আকাশ
	দক্ষিণারঞ্জন বসু	লাইলাক একটি ফুল
	ভক্তি দেবী	যদি জানতেম
অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	কালিদাস কাব্য
	ভার্জিল	দি ঈনিড
	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, স°	এইচ. জি. ওয়েলসের গল্প
	জ্যাক লণ্ডন	হোয়াইট ফ্যাঙ ; নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অনু°
	সুসান কুলিজ	কেটির কাণ্ড ; বীরু চট্টো:, অনু°
	জুল ভার্ন	ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন ; মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°
	"	এরাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ ; মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু°
	"	রাশিয়ার রাজদূত : মাইকেল স্টগফ ; মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, অনু°
	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	গ্রীক পুরাণের আরও গল্প
	অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, স°	বিদেশী গল্পগুচ্ছ
	"	হাল্কা হাসির গল্প

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির	ব্যালান্টাইন	দি ডগ ক্রুসো ; অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, অনু°
	আর্ভিং স্টোন	জীবন পিয়াসা ; নির্ম্মল গঙ্গোঃ, অনু°
	শৈবাল চক্রবর্ত্তী	সোণালী ছড়া
	আরবি	ওলিম্পিক
	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	নূতন পুরাণ
	হেমেন্দ্রকুমার রায়	রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার
	মণিলাল অধিকারী	রক্তাক্ত-বুদ্ধ
	কার্ত্তিক মজুমদার	ক্ষণিকা
	প্রশান্ত চৌধুরী	বংশীদাদুর চাঁদা
	"	মাঠকোঠা
	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন
অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ	দাতা	শ্রীমা সারদামণি
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	J. Nehru	Jawaharlal Nehru : an autobiography
	M. K Gandhi	To the princes & their people
	"	The Indian States problem
অশোক উপাধ্যায়	ভোলানাথ মোহান্ত	রাঙামাটি
	—	ভারতের শত্রু চীন
	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	আলো আঁধারি
	"	হবিত্রী
	লুই ফিসার	আবার রাশিয়ায় ; কান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, অনু°
	অমর চৌধুরী, স°	বনফুল
	করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	ছায়া
	বীরেশ্বর মজুমদার	বটুক মাস্টার
	কানাইলাল গোস্বামী	তটিনীর তটে
	অতুলচন্দ্র বসু	প্রাচ্য দিগন্তে সুভাষচন্দ্র
	"	শশিকান্তের মহাজ্ঞান
	আর্নস্ট টলার	কারাপ্রান্তর থেকে
	কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	মন্দার ও মালঞ্চ
	—	একাগ্নী

উপহারদাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অশোক উপাধ্যায়	অজিত ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য স°	কামকাঞ্চন (১ম)
	—	নীতিবাদ (১ম)
	—	তত্ত্বসার (১ম)
	—	কালচার (১ম)
	প্রিয়নাথ দাস, অনু°	বৃন্দাবনের চক্রবর্ত্তী মহাশয়
	গুরুপ্রিয়া দেবী	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (৩য়)
	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, স°	হায় ছায়াবৃতা
	ধীরানন্দ ঠাকুর	মঞ্জরী
	সুবোধ রায়, স°	মৌন-মিছিল
	ব্রজেন মজুমদার	অতলান্ত
	বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী	ক্ষুধার কাব্য
	কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়	যুগের কাব্য
	কমলেশ সেন	হোচিমিনের কবিতা
	কনক মুখোপাধ্যায়	রৌদ্রধারা
	হরিদাস মুখোপাধ্যায়	বেদের বর্ণমালা
	সুভাষ মুখো: ও অন্যান্য	তিন তরঙ্গ
	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বিবাহ মঙ্গল
	যতীন্দ্রকুমার মজুমদার	আচার্য্য সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
	হরিপ্রসাদ নাথ	সহজ সাঁওতালী ভাষা
	দুর্গামোহন কুশারী	পল্লী
	দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	পান্থপাদপ
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পয়লা নম্বর
	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	যে দেশে মানুষ সত্য
	—	রবীন্দ্র প্রতিভা (সংস্কৃত)
	বিনয় মজুমদার	আমার ঈশ্বরীকে
	রাম বসু	যখন যন্ত্রণা
	A. V. Gopalacharya	Vedanta-rakshamani Vimarsa
	—	The Dhammapada
	Birendranath Roy, tr.	Tagore's Chitrangada
	—	Tagore Visits the U.S.

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
অশোক উপাধ্যায়	দীনেশচন্দ্র রায়	দাড়ি মাহাত্ম্য
		হীরাঝিল কাব্য
	খাফী খান	প্রিয়াঙ্গী
	সমরজিৎ কর	জলকন্ন
	—	ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা
	—	মরালী
	কার্ল রেমন	ঐতিহাসিক বান্দুং
	—	অরণ্যপুষ্প
	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	শ্রেষ্ঠ রহস্য গল্প
	—	মানসী, মার্চ-আগস্ট ১৯৬১ খ্রী:
	নিকোলাই মেইজাক	মহৎ সম্ভাবনার দেশ সাইবেরিয়া
	কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী	রাহুলের পদাবলী
	—	শ্রীমৎ বালক ব্রহ্মচারী উপদিষ্ট তত্ত্বালোক
	সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, স°	আকাল
	রামেন্দু দত্ত	নব-মঞ্জরী (গান ও স্বরলিপি)
	শশীভূষণ দাস	ভূষণ ফোনেটিক সর্টহ্যাণ্ড
	গৈলা সম্মিলনী	গৈলার কথা
	—	India's answer to Chinese aggression
	—	China's betrayal of India
	Himansu Bhattacharya, tr.	Illusion or Reality ?
	Zelenin, V.	Strengthen your heart
	Doroshinskaya, Y.	This is Soviet democracy
	M. C. Aggarwala	Congress whither ?
অশোককুমার ভঞ্জচৌধুরী	দাতা	গল্পের মতো গল্প
	”	ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী (১ম)
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	”	বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (১ম)
	”	বাংলার লোক-সাহিত্য (৩য়)
উমা মুখোপাধ্যায়	”	Two great Indian Revolutionaries.

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
উমেশচন্দ্র মহাপাত্র	দাতা	সংযুক্তা
এ. কে. সরকার এণ্ড কোং	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস
	ক্ষেত্র গুপ্ত	মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প
	”	হেমচন্দ্রের নির্ব্বাচিত রচনাবলী
	শ্রীকুড়রাম	বিক্রোমর্ব্বশী
	”	অভিজ্ঞান শকুন্তলা
	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	রেলরঙ্গ
	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ছোটদের আরব্য উপন্যাস
	তারাপদ রাহা	ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি
	—	ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন—সব সেরা
	মনোরম গুহঠাকুরতা	নানাদেশের রূপকথা
	প্রমথনাথ বিশী	সমুচিত শিক্ষা
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	জায়া
	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	তুমি সন্ধ্যার মেঘ
	স্বপনবুড়ো	স্বপনবুড়োর সফর
	খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অনু°	বত্রিশপুতুলের উপাখ্যান
	আশা দেবী	হাসির গল্প
	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	হাসির গল্প
	বুদ্ধদেব বসু	হাসির গল্প
	আশাপূর্ণা দেবী	হাসির গল্প
	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	হাসির গল্প
	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	মহাভারতের গল্প
	কৃষ্ণধন দে	পুরাণের সেরা গল্প
	”	গল্পে কাদম্বরী
	”	দশকুমার চরিতের গল্প
	অশোক গুহ, অনু°	পিকউইক পেপারস
	”	ওয়ার অ্যাণ্ড পীস
	”	রবিনসন ক্রুসো
	বিশু মুখোপাধ্যায়, অনু°	অ্যাডভেঞ্চার অব্ লে ভেরী
	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	গল্পের রাজা ক্রিলফের গল্প
	”	স্বপ্ন জাগর
	চন্দ্রহাস	নীলসাগরের নীচে

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
কালীপদ বিশ্বাস	দাতা	শ্রীশ্রীরসিকমোহন কথামৃত (১ম)
	"	ভক্ত ভগবান নিমাই
কুমুদনাথ দাস	"	সাহিত্য জিজ্ঞাসা
ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২য়)
গান্ধী স্মারকনিধি (বাংলা)	নির্ম্মলকুমার বসু, সঙ্ক°	গান্ধীর রচনা সঙ্কলন
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত	দাতা	ধূসর পথের ধুলা
		প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়
চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	আলোকনাথ চক্রবর্ত্তী	ঘেঁটুর কথা
	মোজাম্মেল হক	তাপসকাহিনী
	সুকুমার ভট্টাচার্য্য, স°	জ্ঞানদাস রচিত যশোদার বাৎসল্যলীলা
		সংস্কৃত রবীন্দ্রম্
	ধীরানন্দ ঠাকুর	বাংলা উচ্চারণ কোষ
	গুণদাচরণ সেন	বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (সাধন ভাগ)
	আশরাফ মাহ্‌মুদ	কুটজ, এ. কে. এম. আমিনুল হক, অনু°
	শিবপ্রসাদ ডগরাল	অলকনন্দা উপত্যকা
	শঙ্কর সেনগুপ্ত ও অক্ষয়কুমার কয়াল, স°	বিবিধ প্রবন্ধ
চিন্ময় মজুমদার (গ্রন্থনিলয়)	সুধীরকুমার করণ	লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ
	ক্ষুদিরাম দাস	চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী
	ক্ষেত্র গুপ্ত	নাট্যকার মধুসূদন
		কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী
		আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
		সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার
		কবি মুকুন্দরাম
	ক্ষেত্র গুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	বাংলা নাটকের আলোচনা (১ম)
	ক্ষেত্র গুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত	বাংলা নাটকের আলোচনা (২য়)
		বাংলা উপন্যাসের আলোচনা
জাহেদ আলী		গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ১৩৫৩, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৭১, ১৩৭২

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
জাহেদ আলী	—	পি. এম. বাগচী পঞ্জিকা ১৩৫৪—৬১ ১৩৬৬—৭০
	—	সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৩৬২
ডি. মেহেরা	বরিস পাসটেরনাক	ডাঃ জিভাগো ; দীপক চৌধুরী, অনু°
(রূপা অ্যাণ্ড কোং)	তারকমোহন দাস	আমার ঘরের আশে পাশে
	অতীন্দ্রনাথ বসু	নৈরাজ্যবাদ
	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোঃ, অনু°	ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ
	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী
	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	বাঙালী
	চিত্তরঞ্জন মাইতি	বাংলা কাব্য প্রবাহ
	শচীন্দ্রনাথ মজুমদার	বিবাহ-সাধনা
	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন
	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল
	অমিয়কুমার মজুমদার	রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস
	দেবব্রত রেজ, অনু°	সাহিত্য ও বিজ্ঞান
	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্যের কথা
	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	চলমান জীবন (২য়)
	মহাদেবী বর্ম্মা	ছায়াময় অতীত
	অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর
তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	দাতা, স°	শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা
দেবকুমার বসু	দাতা, স°	বিদ্যাসাগর রচনাবলী (১ম, ২য়)
	অনিল চট্টোপাধ্যায়	সঙ্ মিছিল
	বিধান মিত্র	জগদীশ্বরোবা
	তরু দত্ত	বিআংকার রাজা ; পল্লব সেনগুপ্ত, অনু°
	ম্যাক্সমুলার	রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী ; সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, অনু°
	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	সারদামঙ্গল ; গৌরাঙ্গ ভৌমিক, স°
	কৃশাহু বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তর সন্ধ্যায়
	কণিষ্ক	নবাব-নন্দিনী ঘসেটী
	রবীন্দ্রনাথ সামন্ত	নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
দেবকুমার বসু	প্রিয়তোষ মৈত্রেয়	ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা
	সজল বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃষ্ণা আমার তরী
	—	আমাদের বিবেকানন্দ
	প্রিয়দারঞ্জন রায়	বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি
	কৃষ্ণ দাশ	রৌদ্র শিশিরের কবিতা
	—	বাংলা পুস্তকের তালিকা : বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট
	—	Catalogue of Library Books : Inst. of Engineers (India)
	—	Rammohan Roy—His life & teaching
	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	সম্ভবা
	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	করে দেখ (২য়)
	স্বামী সন্তোষানন্দ	পঞ্চশস্য
	অন্নদাশঙ্কর রায়	পাহাড়ী
	প্রিয়তোষ মৈত্রেয়	দর্শন ও মানুষ
	অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী	ছোটদের অশোক
	বিমল মিত্র	শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
	প্রমথনাথ বিশী	বিচিত্র সংলাপ
	চাণক্য সেন	রাগ নেই
	নবকুমার	স্বপ্নসঙ্গিনী
	রাহুল সাংকৃত্যায়ণ	অগ্নিবাক্ষর
	কুশল মিত্র	ধুলো পায়ে লগ্ন
	"	চৈত্রের পলাশ ও মায়াবতী মেঘ
	গুরুদাস সরকার	তিব্বতের যাত্রাগান
	রবীন্দ্র মজুমদার	বাংলার লোকশিল্প
	সঞ্জয়	মনের আকাশ
	করুণাসিন্ধু দে	কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা
	রণেন্দ্রনাথ দেব	বৈষ্ণব কাব্যের তিন দিক
	"	প্রাচীন বাংলা কাব্য প্রদক্ষিণ

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
দেবকুমার বসু	শ্রীপঞ্চক	আধেক খোলা বাতায়ন
	রবি মিত্র ও দাতা	শিশির সান্নিধ্যে
	প্রণব বসু	অতলান্ত
	সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	ছোট ছোট ঢেউ
	পারাবত	যে জীবন দীন
	অমরেন্দ্র দাস	কালীঘাটের ঘরসংসার
	অতনু রেজ	দণ্ডিত অস্তিত্বে নির্ব্বাসন
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	তেইশ বছর আগে পরে
	শ্রীমন্ত সওদাগর	এর পূরবী ওর বিভাস
	সুশীল জানা	দ্বিতীয় জীবন
	নারায়ণ সান্যাল	অলকনন্দা
	,,	মহাকালের মন্দির
	বিমল দত্ত, অনু°	অলিভার টুইষ্ট
	সুনির্ম্মল বসু	মরণের মুখে
	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	আগুনের পাহাড়
	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	টিকিমেধ
	জরাসন্ধ, স°	নাম নেই
	চিত্ত সিংহ	
	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	অনন্ত নক্ষত্র তুমি অন্ধকারে
	যুগান্তর চক্রবর্ত্তী	তিমির সীমান্ত
	রাম বসু	যখন যন্ত্রণা
		দৃশ্যের দর্পণে
		নীলকণ্ঠ
		ব্রীজ
দেবপ্রসাদ মিত্র		রবীন্দ্র বাণী
(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ)		
ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখো:	দাতা	শীতরাত্রি
নবকুমার গড়াই		অন্তরালে
নিত্যগোপাল সামন্ত		দুই ঝড়-এক মেঘ
		মরা নদী-ভরা জোয়ার
		পাথর ভাঙা কান্না
নিমাইকুমার ঘোষ		যুগে যুগে কালে কালে

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
নির্মলকুমার বসু	দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	চাবের-পাঁজি
	কিরণচন্দ্র দত্ত	অর্চ্চনা
	ফকীরমোহন সেনাপতি	উনিশ বিঘা দুই কাঠা
	গণেন্দ্রচন্দ্র বসু	ইলেকট্রিক ইন্‌স্টলেসান্
	দাতা	Gandhiji : the man & his mission
	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য	ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য
	K. P. Biswas	An Indian in Germany
		First Annual Report, 1965-66 : Amateur critics
পবিত্রকুমার সেনগুপ্ত	দাতা	শ্রাবণ
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়	ভাই গিরীশচন্দ্র সেন
	কেশবচন্দ্র সেন	নবসংহিতা
প্রফুল্লচন্দ্র পাল	হরেকৃষ্ণ মুখো: ও অন্যান্য	রসকল্পবল্লী
প্রমথনাথ চৌধুরী	দয়ালচন্দ্র ঘোষ	প্রসাদপ্রসঙ্গ ; প্রমথ চৌধুরী, স°
ফণিভূষণ রায়	ধনঞ্জয় দাস মজুমদার	ভারত ও ভারতের বাহিরে বাঙ্গালীর অবদান
		রাণী রাসমণি স্মরণে
বংশীধর মুখোপাধ্যায়	Layard, Austen H.	Discoveries in the ruins of Nineveh & Babylon
বগলাকুমার মজুমদার	—	আয়ুর্ব্বেদ ভারতী—৩য় এবং ৪র্থ বর্ষ
বর্দ্ধমান স্থানক জৈন শ্রাবক সংঘ, বোম্বাই-৪	—	The Isibhasiyaim
বাণী বসু	সুনীলবিহারী ঘোষ ও বাণী বসু, সঙ্ক°	বিবেকানন্দ গ্রন্থপঞ্জী
বামাপদ বসু	দাতা, অনু°	অমরুশতক
বি. কে. দত্তগুপ্ত	সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ	আলোর দেশ
	অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়	অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী
	—	The Voice of Keshub
বিচিত্রা	ভবেশ দাশগুপ্ত, স°	রবীন্দ্র-জীবন-পঞ্জী
	অপর্ণা সেন	নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ
	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য	ভারততীর্থ

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
বিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঝাউ বাংলোর রহস্য
	সেলমা লাগেরলফ	তরাই-এর তরুণী ; লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, অনু°
	সমারসেট মম	আবরণ ; সুজন বিশ্বাস, অনু°
	প্রমোদ সাহা	মুক্তিপায়ী মন
	মৈত্রেয়ী দেবী	স্তবক
	সীতা দেবী	আজব দেশ
	খগরাজ	কুমড়ো পটাশ
	"	পিকনিক
	"	মুশকিল আশান
	"	অভিনয়
	চিত্তরঞ্জন দেব	ছেঁড়াঘুড়ি
	,,	শ্রীনিকেতন পরিচয়
	"	শান্তিনিকেতন পরিক্রমা
	"	ঐ (হিন্দী)
	"	Our Santiniketan
বিনয় দত্ত	Cust, Robert Needham	Linguistic & Oriental essays (2nd series)
বিনয় মজুমদার	দাতা	এই সব সত্য
বিমলচন্দ্র দাস	,,	স্মৃতিতীর্থের ঘাটে ঘাটে
বিমানবিহারী মজুমদার	,,	শ্রীশ্রীক্ষণদা-গীতচিন্তামণি
	,,	কৃষ্ণ কর্ণামৃত
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	মহাভারতের গল্প
বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার	,,	কর্ণ-কুন্তী
বীরেন্দ্রনাথ রায়	,,	অনুভূতির পরশ ও আলেখ্য
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য	,,	পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর
বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য	,,	বিপ্লবের অন্তরালে
	,,	এক ফোঁটা
	,,	বিদ্রোহী বাঙ্গালী
	"	পক্ষ দুই চন্দ্র এক
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	"	বিপ্লবের পদচিহ্ন
ভোলানাথ মোহান্ত (সঃ ব.সা.প. বর্দ্ধমান শাখা)	দাতা ও সুধীরকুমার অধিকারী	পাঁচালীকার দাশরথী রায় ও তাঁর সাহিত্য

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
মদনমোহন গরাই	দাতা	রামমোহন : সময় জীবন সাধনা
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়	—	প্রভাত গ্রন্থাবলী (৩য়)
মুকুন্দলাল গোস্বামী	দাতা	তুলসী অর্পণবিধি
যোগেন বসু	Briggs ; John ; tr.	History of the Rise of the Mahomedan Power in India. vols. I, II & III.
	Manucci, Niccolao	Sotoria do Mogor ; vols. I & II.
যোগেশচন্দ্র বাগল	দাতা	স্ত্রীশিক্ষার কথা
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	গুণাভিরাম বরুয়া	রামনবমী-নাটক
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	দাতা	বাণী বীণা
রাধাচরণ রায়	"	শ্রীশ্রীচণ্ডীর সারাংশ
শশাঙ্কশেখর সিংহ	"	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত
শিপ্রা দত্ত	"	এরা ভুল করে বারে বারে
শিবশঙ্কর মিত্র	সতীশচন্দ্র মিত্র	যশোহর খুলনার ইতিহাস, দাতা, স°, ২য় খণ্ড, ২য় সং
শীতাংশু মৈত্র	দাতা	রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য
শ্রীশকুমার কুণ্ড (জিজ্ঞাসা)	মণি বাগচী	শিক্ষাগুরু আশুতোষ
	"	সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রমেশচন্দ্র
	অবন্তী দেবী	ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলের নবযুগ।
	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী
	সুবোধ বসু	পদধ্বনি
	"	রাজধানী
	ভবতোষ দত্ত	কাব্যবাণী
	সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া	বুদ্ধপথ
	বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য	বাগর্থ
	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য	কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ
	প্রবোধচন্দ্র সেন	ছন্দ পরিক্রমা
	সুধা সেন	মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর
	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
শ্রীশকুমার কুণ্ড (জিজ্ঞাসা)	অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য	বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
	দীনেশচন্দ্র সেন	পৌরাণিকী
	"	ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ
	"	ফুল্লরা
	"	জড়ভরত
	"	বেহুলা
	"	সতী
	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার দাস	হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস
	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	কাব্য-পরিমিতি
	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	শেলী
সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়	অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	মুণ্ডকোপনিষদের সাধন পথ
	দাতা	নীতিবিদ্যালয়ের কথা
	কেশবচন্দ্র সেন	ব্রহ্মগীতোপনিষৎ
সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	দাতা	বরণীয় যাঁরা
	"	একাত্মিকা
সমর বসু	জ্যোতিরিন্দ্র রায়	ত্রিস্রোতা
	"	প্রণয় একটি প্রাণ শিল্প
সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়	দাতা	আমাদের গ্রাম
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	উমাপদ রায়	জীবনালোক
	—	ব্রহ্মসঙ্গীত (১৩শ সং)
	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান
সাহিত্য একাডেমী (নয়া দিল্লী)	—	সংস্কৃত-রবীন্দ্রম্
সি. এল. গোস্বামী, (গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর)	—	রাধামাধব-রস-সুধা (হিন্দ
সুকুমার রায়	দাতা	অপিস কলকাতার সীমানায়
সুধীন্দ্রনাথ সরকার	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	রাঙা ছবি
	"	খেলার সাথী
	"	হাসিখুসি (২য়)
	"	হাসিরাশি
	"	হাসি ও খেলা

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
সুধীন্দ্রনাথ সরকার	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ছড়া ও পড়া
	"	ছবির বই
	"	হিজিবিজি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	দাতা	সাংস্কৃতিকী
	"	রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ
সুনীলকুমার মণ্ডল (মণ্ডল বুক হাউস)	রাহুল সাংকৃত্যায়ণ	পুরাণো সেই দিনের কথা : শ্রীভগীরথ অনু°
	শ্রীবাসব	শ্রীবাস অঙ্গন
	দ্বৈপায়ণ	মতিবাঈ
	মোহিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	বিবি যদি রাণী হ'ত
	নারায়ণ সান্যাল	অলকনন্দা
স্বামী শ্যামলানন্দ	দাতা	হিমালয়ের চারধাম
A. C. S. Chari	—	An Introductory Sketch on the life & works of Avatar Meher Baba ; 3rd revised ed.
	P. B. Mukherjee	The uttering of the one world
	—	অবতার মেহের বাবার বাণী ও মর্ম্মকথা
	—	শ্রীশ্রীমেহের বাবার জীবন-কথা ও বাণী
	—	অবতার মেহের বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ও বাণী
	—	অবতার মেহের বাবা
Govt. College of Art & Craft, Calcutta		Centenary Volume
Govt. of West Bengal, Tribal Welfare Dept., Cultural Research Institute		The Malpaharias of West Bengal

উপহার দাতা	গ্রন্থকার	গ্রন্থ
Indian Book Distributing Co.	Asit Kumar Sen	People & Politics in early mediaeval India
Principal, Goenka College of Commerce, Calcutta	—	Diamond Jubilee Souvenir Volume
Radhakamal Mukherjee	দাতা	The Dynamics of morals
Ramkrishna Sarada Mission, Sister Nivedita Girls' School.	—	Complete works of Sister Nivedita : Birth Centenary Pub., Vol. I
Supdt. of Census, W. B. & Sikkim	—	Census of India, 1961. Vol. XVI, Pt. II B (ii) Pt. II C (iii) Village Survey Monograph on Raibaghini
U.S.I.S., Calcutta	রিচার্ড হেনরী	যখন নাবিক ছিলাম ; এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অনু°
	জেরী ভুরইশ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় ব্যবস্থা ; অনিলরঞ্জন গুহ, অনু°
	ওয়াল্টার ডি. এডমণ্ডস	মোহকভ্যালির রণবাদ্য ; দীপক চৌধুরী, অনু°
	ফস্টার রে ডালেস	আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী ; রাখাল দত্ত, অনু°
		চিরন্তন সীমানা

ইহা ব্যতীত ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে ও শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্ত যথাক্রমে ১০০১ খানি এবং ১৮ খানি পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

এই তালিকায় উপহৃত খুচরা পত্রিকার হিসাব ধরা হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিসপ্ততিতম বর্ষের কার্য্যবিবরণ

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও ৭৩তম প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া ৭২তম বর্ষের কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিতেছি।)

স্বাভাবিক অবস্থা চলিলে এ বৎসরের বিবরণ আমাকে পাঠ করিতে হইত না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, নিজ পদে আসীন থাকাকালে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত ২৪ মাঘ, মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে, অকালে পরলোকগমন করিবার ফলে সম্পাদকের গুরু কার্য্যভার আমার উপরে ন্যস্ত হয়। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মৃত্যুতে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। পরিষদ্ তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বদিনেও অত্যন্ত অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি পরিষদের কাগজপত্র সহি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্মরণে বিগত ১৪ ফাল্গুন ১৩৭২ তারিখে সভা আহ্বান করিয়া আমরা আমাদের শোক প্রকাশ করিয়াছি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছি।

বিগত বৎসরটি আমাদের পক্ষে দুর্বৎসর স্বরূপ অতিবাহিত হইয়াছে। ঐ বৎসরে আমরা কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, সাহিত্যসেবী, মনস্বী ও সদস্যকে হারাইয়াছি। তাঁহাদিগকে প্রথমে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

৺দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, ভারতকোষ-সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য, বিলুপ্তপ্রায় অথর্ব্ববেদের পৈপ্পলাদ সংহিতার আবিষ্কারক ও সম্পাদক সুপণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিগত ১৭ কার্ত্তিক ১৩৭২ তারিখে ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে দেশবাসীর এবং বিশেষ করিয়া পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ লাহা :—পরিষদের একান্ত হিতৈষী, সুপণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য, পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সহকারী সভাপতি হিসাবে নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি পরিষদের আজীবন-সদস্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ একজন সুহৃদ্ হারাইয়াছেন।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম হিতৈষী, পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বিগত ৩রা মাঘ ১৩৭২ তারিখে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইল।

এতদ্ব্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীর মহাপ্রস্থান ঘটিয়াছে, যথা :— যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরকার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু, বৈজ্ঞানিক হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাহিত্যিক অশোক গুহ, দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল, অবিনাশ ঘোষাল, অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চরণদাস ঘোষ, হারীতকৃষ্ণ দেব, অমীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। পরিষদের সদস্য ও ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি শান্তি পাল, মেদিনীপুর-শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও মূল-পরিষদের সদস্য মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সুধীরচন্দ্র সাহা :—আয়ব্যয়-সমিতি ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অনাথনাথ ঘোষ :—১৩৩৮-৪১, ১৩৪৪-৫৪ এবং ১৩৫৬ সন পর্য্যন্ত পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং হিসাব-বিভাগের বহু বিষয়ে পরিষদ্‌কে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী বীণাপাণি দেবী পরিষদের আজীবন-সদস্য ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

জন্মবার্ষিক উৎসব

বিগত ১৮ শ্রাবণ ১৩৭২ কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসুর ১০৯তম জন্মবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, কবি নরেন্দ্র দেব, শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন প্রভৃতি কবির প্রতিভা ও কীর্ত্তির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত কয়েকজন মনীষীর জন্মশতবর্ষ-পূর্ত্তির উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১৩৭২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা :—

সভাপতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সভাপতি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। পরে: শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

(বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ২৪.১০।৭২ তারিখে পরলোকগমন করায় উক্ত তারিখ হইতে ২১।১১।৭২ তারিখ পর্য্যন্ত অন্যতম সহঃ সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২১।১১।৭২ তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু সম্পাদক নিযুক্ত হন।)

সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

১৩৭২ বঙ্গাব্দের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ:—শ্রীমতী উমা সেন, শ্রীকাঞ্চনকুমার দাস, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শাখা-পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিগণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (গৌহাটি), শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ (বিষ্ণুপুর), শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—শ্রীবিপ্লবকুমার দাস।

১৩৭১ বঙ্গাব্দে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্য-সংখ্যা—

বান্ধব—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট-সদস্য—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীলকুমার দে।

আজীবন-সদস্য—৫০ জন।

সাধারণ সদস্য—মফঃস্বল ৪১ জন।

সহর ৮০২ জন।

১৩৭২ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের সকল কার্য্য পরিচালনা করেন। আলোচ্য বৎসরে এই সমিতির মোট এগারটি অধিবেশন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনের নামগুলি বঙ্গাক্ষরে বড় বড় হরফে লিখিবার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ—যথা, বিহার, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চলের স্টেশনের নাম-

ফলকগুলিও বঙ্গাক্ষরে লিখিবার জন্য একটি প্রস্তাব ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গ্রন্থাগার, গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি শাখা-সভা ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়।

বর্ত্তমান বৎসরে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ (জন্মশতবার্ষিক গ্রন্থ) :—ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবাহু, দশমহাবিদ্যা। অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রজনী। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ২৪।২৮।২৯।৩৩,৩৪ সংখ্যক গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৬৭ সালের ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৩৬৯ সালের ১ম—৪র্থ সংখ্যা যুগ্মসংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যাগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

শাখা-পরিষদ্ :—আলোচ্য বর্ষে নৈহাটী, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, শিলং ও ভাগলপুর-শাখাগুলি কর্ত্তৃক যথাক্রমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মতিথি, মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ-পূর্ত্তি উৎসব পালিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ-শাখাপরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :—

১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা সমিতি এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পদক ও পুরস্কার সমিতি :—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়।

২। সরোজিনী বসু পুরস্কার সমিতি :—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

৩। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা-সমিতি :—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

৪। লীলা পুরস্কার সমিতি :—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

(খ) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের "নরসিংহ দাস" পুরস্কার-সমিতি :—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) এশিয়াটিক সোসাইটির Rabindra Nath Tagore Birth Centinary Plaque সমিতি :—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(ঘ) গোখলে জন্মশতবার্ষিক উৎসব সমিতি :—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

(ঙ) Tamil Writers Association সমিতি :—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

(চ) নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন :—শ্রীকুমারেশ ঘোষ।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৭৩৬খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্রীত ৫খানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৭৩১ খানি। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী আভাময়ী ঘোষ তাঁহার পিতা ৺নরেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত ১৩৭খানি পুস্তক পরিষদে দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য শ্রীমতী ঘোষকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ সংগ্রহের ২৪৫০খানি এবং যতীন্দ্রনাথ পাল-সংগ্রহের ৩৯৯৪খানি পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই বৎসরে পুস্তক আদানপ্রদানের যে পরিসংখ্যান করা হইয়াছে, তাহার তালিকা এইরূপ :-

বিষয়	পাঠকক্ষ	লেনদেন	মোট পুস্তক
দর্শন (১০০)	৬৪	৮৩	১৪৭
ধর্ম্ম (২০০)	১৬৮	১৯০	৩৫৮
সমাজবিজ্ঞান (৩০০)	১৮২	৬১	২৪৩
ভাষাতত্ত্ব (৪০০)	৬৩	১৭	৮০
বিজ্ঞান (৫০০)	২২	১৭	৩৯
ব্যবহারিক বিজ্ঞান (৬০০)	৭	১৭	২৪
শিল্পকলা (৭০০)	৪০	৯৬	১৩৬
সাহিত্য (৮০০)	১৭০৭	৩৬১৬	৫৩২৩
ভূগোল (৯১০)	১০০	১৪৩	২৪৩
জীবনী (৯২০)	২৭৬	২৪৯	৫২৫
ইতিহাস (৯০০, ৯৩০-৯৯০)	২৯৬	১০৯	৪০৫
সহায়ক গ্রন্থ (Ref.)	২৩৪	৫৯	২৯৩
পত্রপত্রিকা	৪১৪৬	২	৪১৪৮
মোট	৭৩০৫	৪৬৫৯	১১৯৬৪

ভাষানুযায়ী

ভাষা	পাঠকক্ষ	লেনদেন	মোট পুস্তক
বাংলা	৬৫৪১	৪৪৭১	১১০১২
সংস্কৃত	৫৮	২১	৭৯
ইংরেজী	৭০৬	১৬৭	৮৭৩
মোট	৭৩০৫	৪৬৫৯	১১৯৬৪

এই সময়ে গ্রন্থাগার ২৫৩ দিন খোলা ছিল এবং মোট ১৯৭৬ জন পাঠক গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৭.৮জন)। গড়ে দিনপ্রতি ৪৭.২খানি পুস্তক আদান-প্রদান হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাঠকক্ষে ২৮.৮খানি এবং লেনদেন বিভাগে ১৮.৪খানি।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে কোনপ্রকার সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় কোনপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্য করা সম্ভব হয় নাই।

পুথিশালা

বিগত বর্ষে (১৩৭১ সালে) পুথিশালায় সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা ছিল ৬২২৭। আলোচ্য বর্ষে এগারখানি বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়া, উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬২৩৮। ইহাদের বিষয়বিভাগ এইরূপ,—বাঙ্গালা পুথি ৩৩৮২। সংস্কৃত পুথি ২৫৯৯। তিব্বতী পুথি ২৪৪। ফার্সী ১৩। মোট ৬২৩৮।

আলোচ্য বর্ষে ২৭৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশন্যাল সায়েন্‌টিফিক কালচারাল অরগানাইজেশনের কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি পুথির মাইক্রোফিল্‌ম্‌স্ ফটো তুলিয়া লইবার প্রস্তাব করায় কুড়িখানি মূল্যবান্ সংস্কৃত পুথি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মাইক্রোফিল্‌ম্‌স্ ফটো তুলিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বহু সদস্য ও গবেষণাকারী পণ্ডিত পুথিশালায় বসিয়া পুথি পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতকোষ

ভারতকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশের প্রায় দুই বৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে "ক" শেষ হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের কাজ দ্রুত চলিতেছে। এই খণ্ডটি অন্ততঃপক্ষে ৮০—১০০ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রণ করিবার ইচ্ছা আছে। ভারতকোষ-সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগমন করায় ভারতকোষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুর সম্পাদকত্বে ৩য় খণ্ডের মুদ্রণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আর্থিক অবস্থা

পরিষদের আর্থিক অবস্থার কথা আমরা প্রতি বৎসর বার্ষিক বিবরণে উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হই। বর্ত্তমান বৎসরেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই—বরঞ্চ অর্থসঙ্কট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর ব্যয় সঙ্কোচ কি উপায়ে করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে সেই উপসমিতির প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনবাবুর দেহান্তর ঘটে। ফলে এখনও পর্য্যন্ত সকল প্রস্তাবগুলি কার্য্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

আপনাদের প্রত্যেককে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

নির্ম্মলকুমার বসু, সম্পাদক

ক্রীত পুস্তকের তালিকা—১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
উপনিষৎ—ব্রাহ্মধর্ম্মঃ	—
নব জ্ঞান-ভারতী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পা
প্রত্যক্ষ-শারীরম্। ১ম ভাগ ; ২য় সং	গণনাথ সেন
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী	
বৈষয়িক পরিভাষা ; ৪র্থ সং, ৭ম সং	
সমালোচনা সাহিত্য ; ৪র্থ সং (২ কপি)	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, সং
Alexander Duff	Paton, William
(A) Handbook of legal maxims.	—
Nelson's Esperanto course.	Lock, E. G. & Stuttard, Mason
(The) Slave girl of Agra	Romesh [Chandra] Dutt
(A) Visit to Orissa : a handbook for tourist	